

চাচা নেহরু

শিবানী চট্টোপাধ্যায়

চাচা নেহরু

শিবানী চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায়
'রাজশ্রী'
৯।৪, খানপুর রোড
কলিকাতা-৪৭

প্রথম প্রকাশ :
১৪ই নভেম্বর, শিশু-দিবস, ১৯৬৪

দ্বিতীয় প্রকাশ :
২৬শে জানুয়ারী, সাধারণতন্ত্র দিবস, ১৯৬৫

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনায় :
শ্রীমান পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এক্সপ্রেস প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
২০-এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান :
ইণ্ডিয়ান বুক ডিসট্রিবিউটিং কোম্পানী
৬৫।২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মূল্য—দেড় টাকা

"……এই অন্ধকার রাত্রির অবসানে একদিন দিনের আলো ফুটে উঠবেই। তবে নির্নিমেষ মশাল আমাদের জ্বালিয়ে যেতে হবে পথ দেখাবার জন্য এবং আমি জানতে চাই তোমাদের মধ্যে এমন বলিষ্ঠ বাহু কত জনের আছে, যারা আমার হাত থেকে পড়ে যাওয়া মশাল তাদের হাতে নিতে পারবে। তোমরা সেই ভার গ্রহণের উপযুক্ত হও।"

—জওহরলাল

ভূমিকা

শ্রীমতী শিবানী চট্টোপাধ্যায় রচিত জওহরলাল জীবনী পাঠ ক'রে খুসী হয়েছি। তার একাধিক কারণ আছে।

আমাদের পরম সৌভাগ্য জওহরলাল নেহরুর মত দেশনেতা পেয়েছিলাম। মাইকেল মধুসূদন বলেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের মধ্যে তিনটি মহৎ গুণের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁর ছিল সেকালের ঋষির মনীষা, ইংরেজের কর্মক্ষমতা এবং বাঙ্গালী মায়ের হৃদয়ের কোমলতা। আমরা সেই ভাবে বলতে পারি জওহরলালের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ হয়েছিল যা যুগসন্ধিক্ষণে তাঁকেই ভারতের উপযুক্ততম কর্ণধার হবার যোগ্য করেছিল। তাঁর ছিল পশ্চিমের মানুষের মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভগবান বুদ্ধের মত কারুণ্য এবং অনন্যসাধারণ স্বদেশ-প্রীতি। দেশের মানুষের দারিদ্র্য তাঁর হৃদয়কে বেদনা দিত, দেশপ্রেম তাঁকে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রেরণা দিত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে দিয়েছিল সেই ক্ষমতা যা দেশের ভাবী উন্নয়ন কোন পথে তা অভ্রান্তভাবে নির্দ্ধারণ করতে পারে। তাই দেখি তিনি ধনীর দুলাল হয়েও দেশের কাজে তাঁর সমগ্র জীবন দ্বিধাহীন চিত্তে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই দেখি তিনি ভাঙা ও

গড়ার কাজে সমান দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। বিদেশী শাসকের রচিত পরাধীনতা শৃঙ্খল হতে দেশকে মুক্ত করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। তিনি দেশের বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রচনা ক'রে তার সঙ্গে এমন একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সংযুক্ত করেছেন যাতে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে দেশবাসী সকল মানুষ, বিশেষ ক'রে দরিদ্র এবং অবহেলিত মানুষ ভাগ ক'রে দেশের সম্পদ ভোগ করতে পারে। এমন নেতা কোন্ দেশ পায়?

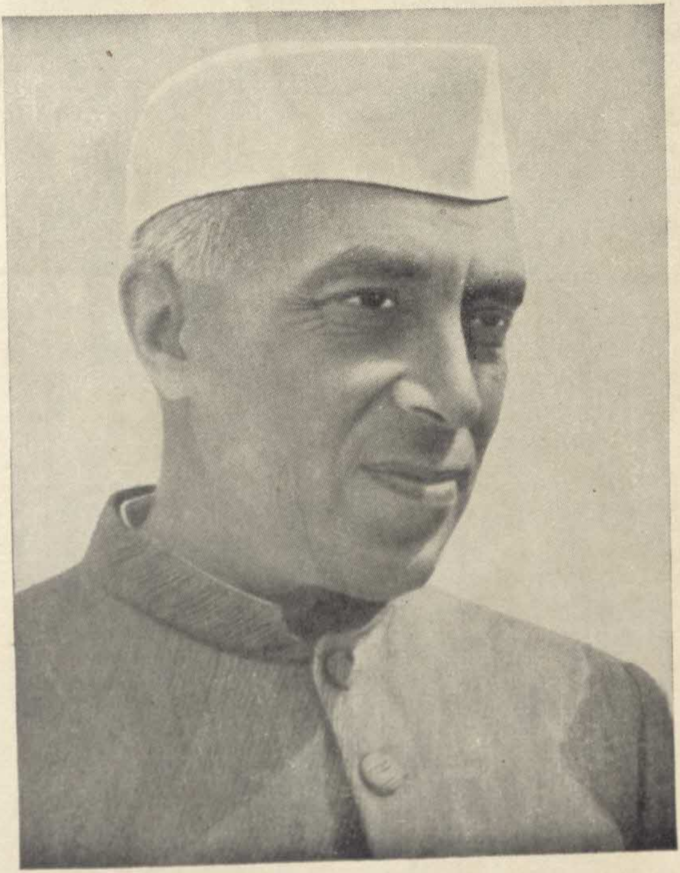
দেশের যারা শিশু তাদের জন্যও তাঁর ভালবাসার অন্ত ছিল না। সেই কারণেই ত তাঁর জন্মদিবস শিশুদিবসরূপে সমগ্র ভারতে পালিত হত। কিন্তু তিনি এখন চলে গেছেন। যে শিশুরা তাঁকে চোখের সামনে দেখত তারা আর তাঁকে দেখতে পাবে না, যারা দেখে নি তাদের ত দেখার কথাই ওঠে না। অথচ আমাদের এই অনন্যসাধারণ দেশনেতা তাদের কতখানি ভালবাসতেন তা তাদের জানা দরকার। আরও জানা দরকার তিনি কত বড় নেতা ছিলেন। তাদের কচি মনে তাঁর মহান আদর্শ যদি দাগ টানতে পারে তা হলে তারা স্বাধীন ভারতের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারবে। সেইখানেই এই পরিচয়ের আরও বড় সার্থকতা।

এই কারণে জওহরলালের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম জন্মদিনের পূর্বেই তাঁর জীবনীকে বিষয় ক'রে একটি পুস্তক রচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আরও প্রয়োজন ছিল তা এমন ভাবে রচিত

হবার যাতে তা শিশুর কাছে সহজগ্রাহ্য হয়, শিশু যেমন ভাষায় বোঝে তেমন সহজ ভাষায় লিখিত হয় এবং শিশুর চিত্তকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। শ্রীমতী শিবানী চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকখানিতে সেই গুণগুলি বর্তমান আছে। কাজেই আগামী ১৪ই নভেম্বর তারিখে তার প্রকাশ সব দিক দিয়ে অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

১১ই নভেম্বর, ১৯৬৪



জওহরলাল নেহরু

এক

সে অনেক কাল আগের কথা। সম্রাট আওরঙ্গজেব তখন মারা গেছেন, ফারুকশিয়ার বসেছেন সিংহাসনে। সেই সময় কাশ্মীরে রাজ কাউল নামে এক পণ্ডিত বাস করতেন। সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় তাঁর খুব জ্ঞান ছিল। সম্রাট ফারুকশিয়ার একবার কাশ্মীরে যান। এই সময়ে রাজ কাউলকে দেখে তাঁর খুব ভাল লাগে। মনে হয় তাঁর কথামতই রাজ কাউল কাশ্মীর থেকে চলে এলেন। সমতল ভূমিতে এসে তিনি পরিবারবর্গ নিয়ে দিল্লীতে বাস করতে লাগলেন। এটা হল ১৭১৬ সালের কথা। একটি নহরের অর্থাৎ খালের তীরে বাড়ী ও কিছু জায়গীর রাজ কাউল বসবাসের জন্য পেলেন। নহর মানে খাল, তাই পারি-বারিক উপাধি 'কাউলে'র সঙ্গে 'নেহরু' যোগ হয়ে 'কাউল-নেহরু' এইভাবে চলতে সুরু হল। তারপর এক সময়ে দাঁড়াল শুধু 'নেহরু'তে এসে।

লক্ষ্মী নারায়ণ নেহরু ছিলেন সরকার কোম্পানীর প্রথম উকিল। তাঁর ছেলে গঙ্গাধর নেহরু ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কিছু আগে দিল্লীতে কোতোয়াল ছিলেন। তিনি ১৮৬১ সালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মারা যান।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় নেহরু পরিবার নিঃস্ব অবস্থায় আগ্রায় চলে আসতে বাধ্য হন। তখনও মতিলালের জন্ম হয় নি। মতিলালের দুই দাদা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যখন দিল্লী ছেড়ে চলে আসেন, তখন একটি মজার ঘটনা ঘটে। মতি-লালের এক দিদি দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন। তখন সিপাহী বিদ্রোহের সময়। ইংরাজরা ভাবল এঁরা বুঝি ইংরাজদের মেয়ে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। এই অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যু। যে সে মৃত্যু নয়, গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি। সৌভাগ্যক্রমে মতিলালের এক দাদা সামান্য ইংরাজী বলতে পারতেন, তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে মেয়েটি তাঁদের বোন। কাশ্মীরীরা অমনি সুন্দর হয়। এমনি সময় পরিচিত এক ব্যক্তি সেখানে এসে পড়ায় তাঁরা মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেলেন।

আগ্রাতে কয়েক বৎসর বাস করবার পর ১৮৬১ সালের ৬ই মে গঙ্গাধর নেহরুর কনিষ্ঠ পুত্র মতিলালের জন্ম হয়। অবশ্য গঙ্গাধর নেহরু তখন আর ইহলোকে নেই। মতিলালের জন্মের তিন মাস আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও মতিলালের সঙ্গে ঠিক ঐ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

জওহরলালের পিতামহ গঙ্গাধর নেহরুকে দেখলে মনে হত অভিজাত মোগল। তাঁর পরণে মোগল দরবারের পোষাক, হাতে বাঁকা তরবারি। চেহারায় কাশ্মীরী ছাপ স্পষ্ট।

পিতৃহীন ও সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান বলে মতিলাল মায়ের অত্যন্ত স্নেহের দুলাল ছিলেন। মতিলালের মায়ের ইচ্ছাশক্তি খুব

প্রবল ছিল। মৃত্যুর বহুদিন বাদেও প্রাচীনা কাশ্মীরী মহিলারা তাঁর প্রখর কর্তৃত্বের কথা ভুলতে পারেন নি।

পিতার মৃত্যুর পর সংসারের ভার পড়ল মতিলালের বড় দুই ভাই বংশীধর ও নন্দলাল নেহরুর উপরে। এঁরা মতিলালের চাইতে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। দাদাদের মধ্যে বড় বংশীধর ইংরাজ সরকারের বিচার বিভাগে কার্যে নিযুক্ত হন। ছোট নন্দলাল রাজপুতনার ক্ষেত্রী রাজের দেওয়ানরূপে দশ বৎসর কার্য করেন। পরে তিনি আইন পড়েন এবং আগ্রায় ওকালতি করতে থাকেন। মতিলাল নন্দলালের কাছেই থাকতেন। তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় তিনি মানুষ। বয়সের পার্থক্যে নন্দলাল শুধু মতিলালের ভাই নয়, পিতার মতই ছিলেন।

আগ্রা থেকে হাইকোর্ট একদিন এলাহাবাদে উঠে এল। নন্দলাল এবং তাঁর পরিবারবর্গও এলাহাবাদে চলে এলেন। সেই দিন থেকেই এলাহাবাদ নেহরু পরিবারের বাসভূমিরূপে পরিচিত হল। এখানে এসে নন্দলাল ক্রমে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নামকরা উকীল বলে পরিচিতি লাভ করলেন। মতিলাল পড়াশুনা করতে লাগলেন এলাহাবাদ ও কানপুরে।

শুধু পার্সী ও আরবী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করলেন তাই নয়, ইংরাজীও শিখলেন মতিলাল। সেই কিশোর বয়সে মতিলাল পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত বলে খ্যাতি লাভ করেন। প্রাচীন মানুষেরা এজন্য তাঁকে বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। পড়াশুনার চেয়ে খেলাধূলার দিকে তাঁর নজর ছিল বেশী।

পাড়ার দুর্দান্ত ছেলেদের তিনি ছিলেন সর্দার। যখন কলিকাতা ও বোম্বাই ছাড়া কোথাও বিলিতী পোষাক আর আচার-ব্যবহারের অনুকরণ কেউ করত না, তখনই এলাহাবাদে মতিলালের নজর এদিকে পড়ে। ভারী তেজী আর দুষ্টু ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও তাঁর অধ্যাপকেরা তাঁকে ভালবাসতেন খুব। কারণ তিনি ছাত্র হিসাবে খুব মেধাবী ছিলেন। পড়া-শুনোয় ফাঁকি দিলেও পরীক্ষায় ফেল করেন নি কখনো।

একে একে অনেক পরীক্ষার বেড়া ডিঙ্গিয়ে শেষের বেলায় গেলেন আটকে। সেও তাঁর নিজেরই ভুলে।

বি. এ. পরীক্ষা দিতে বসেছেন মতিলাল। প্রথম পত্রের উত্তর লিখে মনে করলেন ভাল হয় নি উত্তর লেখা। বাকী পরীক্ষা না দিয়েই চলে এলেন একেবারে সোজা তাজমহলে। তখন আগ্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হত। ভাগ্যের পরিহাস এমনই একজন প্রফেসর যখন জানতে পারলেন যে তিনি পরীক্ষা দেন নি তখন অত্যন্ত রাগ করলেন। বললেন—প্রথম পত্র মতিলাল ভালই লিখেছিলেন। যাই হোক বি. এ. পাশ করা তাঁর আর হল না।

বি. এ. পাশ না করলেও বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। ভারতবর্ষে তখন আইন ব্যবসায়েই একমাত্র প্রতিভার পুরস্কার মিলত অচিরে। সৌভাগ্য-রবি ধরা দিতেন সহজে। তা ছাড়া দাদা নন্দলালের দৃষ্টান্তও তাঁর সামনে তখন। হাইকোর্টে ওকালতী পরীক্ষা তিনি দিলেন। আর শুধু পাশ করলেন না

সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করলেন। পণ্ডিত মতিলাল প্রথমে তিন বছর কানপুরে শিক্ষানবিশী করেন। পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগ দেন। এলাহাবাদে মতিলালের যোগদানের কিছু পরেই পণ্ডিত নন্দলাল মারা যান। সংসারের সব দায়িত্ব পড়ল যুবক মতিলালের উপর। প্রথমে অসুবিধা হলেও একে একে নন্দলালের মক্কেলরাও মতিলালের কাছে আসতে থাকেন। সৌভাগ্যলক্ষ্মী এসে ধরা দিলেন মতিলালের কাছে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সেদিকে। পণ্ডিত মতিলাল কয়েকটি অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু নিজের জীবিকার তাগিদেও বটে এবং এমনিতেও যোগাযোগ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

তাঁর ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংগতি সংসারের খরচও ধাপে ধাপে বাড়িয়ে তুলেছিল। ফলে নেহরু পরিবার আস্তে আস্তে পশ্চিমী কেতাদুরস্ত হয়ে উঠতে থাকেন।

দুই

ইংরাজী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল ও শ্রীমতী স্বরূপরাণী নেহরুর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেদিনের সেই শিশুই আজকের ভারতরত্ন লোকপ্রিয় জওহরলাল।

জওহরলালের যখন জন্ম হয়, তখন বাড়ীতে কোন ছোট ছেলে ছিল না। বিজয়লক্ষ্মী তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। জ্যেঠতুত ভাইয়েরা বয়সে বড় ছিল অনেক। তবু তাঁদের সঙ্গে আলোচনায়ও ছোট্ট জওহরলাল যোগ না দিয়ে পারতেন না। বাড়ীতে বয়ে চলেছে অবশ্য পাশ্চাত্য আবহাওয়া। তা সত্ত্বেও তাঁর দাদারা স্বদেশীয়দের পরে ইংরাজ বা অন্য জাতের লোকদের ব্যবহারে অত্যন্ত উত্তেজিত। ছোট্ট জওহরলাল ব্যথা পেতেন, মনে মনে রেগে যেতেন ইংরাজদের পরে। যদি কোন ইংরাজ ভারতবাসীকে মেরে ফেলত, ইংরাজ জুরীরা বিচার করে তাদের স্বজাতীয়দের ছেড়ে দিত। রেলের কামরা ইউরোপীয়ানদের জন্য আলাদা করা থাকত। কামরায় জায়গা থাকলেও কোন ভারতীয়দের সে কামরায় উঠতে দেওয়া হত না। এমন কি সাধারণের জন্য কোন কামরায় যদি কোন ইংরাজ উঠত, সেখানে এদেশীয় আর কেউ উঠতে পারত না। কোন পার্ক

বা অন্য জায়গাতেও শ্বেতাঙ্গদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকত বসার।

বিদেশীদের দুর্ব্যবহারের কেউ শোধ নিয়েছেন জানতে পারলে জওহরলাল খুব খুসী হতেন। জওহরলালের দাদা বা তাঁর বন্ধুরা প্রায়ই এমনি শোধ নিতেন। তাঁর এক দাদার গায়ে খুব জোর ছিল। আর তিনিই ইচ্ছা করে করে ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতেন। তাঁরা প্রায় বেড়াতে যেতেন রেলে করে। এইসব ঝগড়া আর তর্কাতর্কি বেশীর ভাগ সময় রেলের মধ্যেই বাধত।

ইংরাজদের অত্যাচারে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব জাগলেও বিশেষ কোন ইংরাজকে তিনি অশ্রদ্ধা করতেন না। তাঁর নিজের শিক্ষয়িত্রীই ছিলেন একজন ইংরাজ মহিলা। বাবার বন্ধু বান্ধবও ছিলেন অনেক ইংরাজ। তাঁরা প্রায়ই বাড়ীতে আসতেন কিন্তু তাঁদের কখনও অশ্রদ্ধা করতেন না জওহর।

দাদারা ছাড়া আর একজন সঙ্গী ছিলেন জওহরের। মনের কথা বলবার একমাত্র সঙ্গী তিনি। তাঁর নাম মুন্সী মোবারক আলি। বদায়ূনের খুব বড় ঘরের ছেলে ছিলেন মুন্সীজী। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ সিপাইরা মুন্সী পরিবারের অনেককেই মেরে ফেলে দেয়। সেই ঘটনা মুন্সীজীকে অন্য মানুষ করে তোলে। ছেলেদের তিনি ভাল বাসতেন খুব। শিশু জওহর তাঁর পাকা দাড়ি দেখে মনে করতেন তিনি বুঝি খুব আগেকার দিনের মানুষ। তাই যখনই কোন বিপদে

পড়তেন, কোন পরামর্শের দরকার হত, ছুটে যেতেন মুন্সীজীর কাছে। মোবারক আলি ভাল গল্পও বলতে পারতেন। আরব্য উপন্যাসের গল্প, সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী, তা ছাড়া আরও কত গল্প তাঁকে শোনাতেন মুন্সীজী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবাক হয়ে শিশু নেহরু সেই গল্প শুনতেন। বছরে দুবার ঈদের সময় মুন্সীজী জুম্মা-মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেন। সেদিন তাঁর বাড়ীতে নেহরু পরিবারে শিশুরা মহা আনন্দে মিষ্টি খেতে যেত।

জওহরলাল মুন্সীজীর কাছেই শুধু গল্প শুনতেন না। তাঁর মা জ্যেঠাইমার কাছেও গল্প শুনতেন। সে গল্প রামায়ণ মহাভারতের। বিশেষ করে তাঁর জ্যেঠাইমা অর্থাৎ নন্দলাল নেহরুর স্ত্রী প্রাচীন ইতিহাস পুরাণের অনেক গল্প জানতেন। তাঁর কাছ থেকে ছোটবেলায়ই জওহরলাল ঐ সব গল্প জেনেছিলেন।

মা-জ্যেঠাইমাদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে আর দেবদর্শনেও যেতেন জওহরলাল। সাধু সন্ন্যাসীর কাছেও গেছেন তাঁদের সঙ্গে। বাড়ীতে পাল-পার্বনে ব্রত পূজাও হত। জওহরলালের ভাল লাগত সে সব। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। মনে করতেন ওগুলি শুধু মেয়েদের জন্য। বাড়ীতে বাবা এবং দাদারা পূজা নিয়ে ঠাট্টা করতেন। বড়দের দেখাদেখি জওহরলালও সেই চেষ্টা করতেন।

তবে বড় বড় উৎসবের দিনে আনন্দ থেকে দূরে থাকতে তিনি পারেন নি। হোলির দিনে আবীর খেলতে ভাল লাগত তাঁর।

আবার দেওয়ালীর দিনে গভীর রাত্রিতে হাজার হাজার প্রদীপের আলোতে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন। জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে জেগে থাকা সম্ভব হত না—তবু ভাল লাগত বৈকি! দশহরা আর রামলীলায় রামচন্দ্রের লঙ্কাজয়ের কাহিনীতে যাত্রা হত। অভিনেতারা কথা বলত না। বড় বড় মঞ্চের উপরে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা সেজে সব বসে থাকত। পরে তাই নিয়ে শোভাযাত্রা হত। কত লোক যে তাই দেখতে আসত! সে দলে জওহরও থাকতেন। মহরমের দিন আবার ছেলের দলের সঙ্গে রেশমী পোষাক পরে হাসান হোসেনের শোক যাত্রা দেখতে যেতেন তিনি।

বাড়ীতে ভাইফোঁটা হত। হত রাখী বন্ধন। কাশ্মীরীদের বড় উৎসব বছরের প্রথম দিনে 'নও রোজ' হত। নতুন কাপড় পরত সবাই। পয়সা পেত শিশুরা। কিন্তু সবচেয়ে প্রিয় উৎসব ছিল জওহরলালের কাছে—তাঁর নিজের জন্ম দিনটি।

তাঁকে ঘিরে উৎসব হত বলে আনন্দের সীমা থাকত না জওহরলালের। খুব ভোরে একটি তুলাদণ্ডের একপাশে বসান হত জওহরকে। অন্য পাশে রাখা হত গম আর অন্য অনেক জিনিষ। তারপর সেগুলি বিলিয়ে দেওয়া হত গরীব দুঃখীদের মধ্যে। নতুন জামা কাপড় পরে অজস্র উপহার জওহর সেদিন সবার কাছ থেকে পেতেন। বিকালে হত বাড়ীতে সবার আমন্ত্রণ। এত ভাল লাগত এই দিনটি জওহরের! মনে হত, কেন বছরে একদিন মাত্র তাঁর জন্মোৎসব হয়। আব্দার

করতেন মায়ের কাছে—কেন আরও বেশি জন্মদিন বছরে আসে না।

আত্মীয় স্বজনের বিয়েতে যেতেও তাঁর ভাল লাগত খুব। কেননা তখন কেউ শাসন করত না তাঁকে। অনেক সমবয়সী ছেলে মেয়ের সঙ্গে দেখা হত। প্রাণভরে খেলাধূলা করতেন তিনি। দুষ্টুমির একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। বয়স তখন সাত কি আট। এলাহাবাদে অশ্বারোহী সৈন্যদের একজনের সঙ্গে রোজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেতেন জওহরলাল। তাঁর নিজের জন্য একটি আরবী ঘোড়া ছিল। একদিন হয়েছে কি তিনি পড়ে গেছেন ঘোড়া থেকে। আর ঘোড়া একছুটে বাড়ী গিয়ে হাজির। মতিলাল বন্ধুদের নিয়ে টেনিস খেলছেন তখন। খালি ঘোড়া দেখে ত ভয়ে মরেন সবাই! তখুনি সবাই মিলে খুঁজতে বের হলেন ছেলেকে। ভাগ্যক্রমে পথেই দেখা হল জওহরের সঙ্গে। ছেলে যেন যুদ্ধে জয় করে ফিরছে এমনিভাবে বাবা ছেলেকে নিয়ে ফিরলেন।

বাবাকে খুব ভালবাসতেন, ভক্তি করতেন জওহরলাল। অন্য সবার চাইতে বাবাকে তাঁর অনেক বেশী শক্তিমান, সাহসী আর বুদ্ধিমান মনে হত। শিশু স্বপ্ন দেখতেন বড় হয়ে বাবার মত হবেন তিনি। ভক্তি ভালবাসা থাকলেও বাবাকে ভয় করতেন কিন্তু জওহরলাল। এই ভয়ের কারণও যে একেবারে না ছিল তা নয়। পাঁচ কি ছ'বছর বয়স তখন জওহরের। অফিস ঘরে বাবার টেবিলে দুটো ফাউন্টেন পেন রয়েছে।

দেখে বালক ভাবলেন—দুটো কলমে বাবার কি হবে। একটা কলমেই ত চলে যায়। বরং বাড়তি কলমটা তাঁর নিজের কাজে লাগান যাবে। এই ভেবে একটি কলম নিয়ে নিলেন তিনি। তারপর যা হয়। বাড়ীময় হুলস্থূল। খোঁজ, খোঁজ, কোথায় গেল কলম। পাওয়া গেল শেষে। ভয়ে জওহরলাল কিছু না বললেও মতিলালের জানতে বাকী থাকল না অপরাধী কে! তিনি ভয়ানক রেগে ছেলেকে এমন মার মারলেন যে যন্ত্রনা আর অপমানে মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়ে শিশু বাঁচেন। তবে গায়ের ব্যথা তাতে মরেনি। বেশ কয়েকদিন ওষুধ মালিশ করার পর তবে সুস্থ হন তিনি। এমন বাবাকে ভয় না করে উপায় আছে কারও।

মাকে কিন্তু ভারী ভাল বাসতেন জওহরলাল। মায়ের কাছে কাছে থাকতেন বলেই মাকে তাঁর বাবার চেয়ে আপন বলে মনে হত। যে কথা বাবাকে বলতে পারতেন না সে কথা অনায়াসে মাকে বলতে পারতেন। জওহরলালের দাদামশাইরা মাত্র দু পুরুষ আগে কাশ্মীর থেকে এসে বসবাস করেছেন। তাই কাশ্মীরীদের সহজ সৌন্দর্য তখনও তাঁদের হারিয়ে যায়নি। তার ওপর খুব ফিটফাট থাকতেন স্বরূপরাণী। মায়ের সুন্দর চেহারা, ছোট মেয়েদের মত হাত, পা খুব ভাল লাগত ছেলের। অল্প দিনের মধ্যেই মা-ছেলে মাথায় মাথায় হয়ে উঠলেন। জওহরলাল ভাবলেন এতদিনে আমি মায়ের সমকক্ষ হলাম।

তিন

জওহরের যখন দশ বছর বয়স তখন আনন্দভবন তৈরী হল। এই বাড়ীতে যখন উঠে এলেন ওঁরা, তখন বাড়ী তৈরী সম্পূর্ণ হয়নি। মস্ত বড় এক বাগান আর পুকুরও কাটা হল আনন্দ-ভবনে। আনন্দভবনের নতুন তৈরী বাড়ীতে বিজলী বাতি জ্বলল। এলাহাবাদে এটা নতুন।

এই পুকুরে সাঁতার শিখলেন জওহরলাল। দিনে যে কত বার পাড়ি দিতেন এ পুকুর তার ঠিক নেই। ডাঃ তেজ বাহাদুর সপ্রু তখন এলাহাবাদের নতুন উকিল। তিনি সাঁতার জানতেন না, শেখার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। পুকুরের একটা সিঁড়িতে বসে তিনি স্নান করতেন।

শুধু সাঁতার শিখলেন না জওহরলাল, খেলাধূলাতেও হাতে-খড়ি হল তাঁর এখানে। বাড়ীতে বড় খেলার মাঠ। টেনিস খেলার জন্যেও ছিল ব্যবস্থা। সব কিছু ছিল আনন্দভবনে। পরবর্তী-কালে হ্যারো কেম্ব্রিজে ক্রিকেট আর অন্য খেলায় যে অংশ নিয়েছেন, তার সূত্রপাত বাড়ীতেই।

আনন্দভবনেই জন্ম হল বিজয়লক্ষ্মীর। কোন ছোট ভাই বোন ছিল না বলে দুঃখ ছিল জওহরলালের। তাই এটা ভারী আনন্দের জিনিষ হল তাঁর কাছে। বোন হওয়ার আগে খবরের

জন্য অধীর আগ্রহে তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন। এমন সময় ডাক্তারদের একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—তোমার পক্ষে খুব আনন্দের সংবাদ। তোমার বিষয়ের ভাগ নেওয়ার জন্য ভাই হয় নি। বোন হয়েছে।

জওহরলাল মনে মনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন তাঁকে এত স্বার্থপর ভাবা হয়েছে বলে।

বিজয়লক্ষ্মীর জন্মের সময় মতিলাল বিলেতে। তাঁর বিলেত যাওয়া নিয়ে গোলমাল হয় খুব। ফিরে এসে মতিলাল কিন্তু কারও অনুরোধেই প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী হন নি। এমনি দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল।

এগার বছর বয়সে ফার্ডিনান্দ, টি, ব্রুকস্ নামে একজন নতুন শিক্ষক রাখা হল জওহরের জন্য। ইনি একজন থিয়োজফিষ্ট। যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁদেরই বলা হয় থিয়োজফিষ্ট। শ্রীমতী এ্যানি বেশান্ত এঁকে জওহরের জন্য রাখতে মতিলালের কাছে সুপারিশ করে পাঠান। হিন্দী ও সংস্কৃতের জন্যও একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ব্যাকরণের বিভীষিকায় সংস্কৃতে মন বসে নি তাঁর।

ব্রুকস্ ছিলেন জওহরলালের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম পথ-প্রদর্শক। একটা ছোট্ট লেবরেটারী করেছিলেন তিনি। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পদার্থ-বিজ্ঞান আর রসায়নের প্রাথমিক পরীক্ষায় ডুবে যেতেন জওহর। ব্রুক্সের প্রভাবে লেখাপড়া ছাড়াও থিয়োজফির দিকেও মন গেল তাঁর। এই সময় শ্রীমতী এ্যানি

বেশান্ত এলাহাবাদে এলেন। এসে থিয়োজফি সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতা গভীরভাবে জওহরলালের মনে নাড়া দিল। মাত্র তের বছর বয়সে জওহরলাল মতিলালের কাছে থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দেওয়ার অনুমতি চাইলেন। সেই তের বছর বয়সে থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হলেন তিনি। কাশীতে সম্মেলনে যোগ দিলেন। দেখা হল এই সমিতির আর এক প্রাণপুরুষ কর্ণেল অলকটের সঙ্গে। এই সমিতিতে প্রবেশের জন্য দীক্ষা দিলেন স্বয়ং শ্রীমতী এ্যানি বেশান্ত। শ্রীমতী এ্যানি বেশান্তকে আজীবন শ্রদ্ধা করতেন জওহরলাল।

এই বয়সেই ভগবদগীতা ও উপনিষদ পাঠ শেষ করে ফেলে দিলেন তিনি। সব কিছু না বুঝলেও হিন্দু ধর্মের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা কিন্তু বেড়ে গেল। গীতা পাঠের নেশা তাঁর বরাবর ছিল। তারই একটা পরিচয় আমরা পাই ১৯২৪ সালে। অসুস্থ গান্ধীজীকে দেখতে গেছেন এ দেশের একজন নামকরা শিল্পপতি। মহাত্মা প্রশ্ন করলেন—জওহরকে চেনো?

তিনি সবিনয়ে জানালেন—দূর থেকে দেখেছি। তবে পরিচয় নেই।

বেশ তো তবে দেখা করো। বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করো—গান্ধীজী তাঁকে বললেন।

আলাপ করতে গিয়ে শিল্পপতি দেখলেন বারান্দার এক কোণে চুপচাপ বসে আছেন জওহর। কাছে এগিয়ে

দেখতে পেলেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি গীতা পাঠ করছেন।

এতটুকু বয়সে পড়ে ফেললেন অনেক দেশী বিদেশী বই। ছোটদের সাহিত্যে বেশ অনুরাগ। 'দি জাঙ্গল বুক', 'কিম' ও লুইস ক্যারোলের বই খুব প্রিয় ছিল তাঁর। গুস্তাব ডোরের 'ডন কুইক্‌সট' ও ফ্রিডিয়াফ ন্যানসানের 'ফারদেষ্ট নর্থ' তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছিল। স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে, এইচ, জি, ওয়েলস শার্লক হোমস্, মার্ক টোয়েন—সবার লেখাই কম বেশী পড়ে ফেলেছেন তিনি। কবিতার পরেও অনুরাগ জন্মায় তখনই। সারা জীবনে বহু অশান্তির মধ্যেও সে অনুরাগ হারিয়ে যায় নি।

বুয়োর যুদ্ধ এই সময়েই আরম্ভ হয়। যুদ্ধের খবর জানবার তাগিদে খবর কাগজ পড়তে সুরু করলেন জওহরলাল। সংবাদ পত্রের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় তাঁর।

যুদ্ধ তখন আরও একটা হয়েছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধ। জাপানের যুদ্ধে জয়লাভের খবরে খুসী হয়ে উঠতেন জওহরলাল। রোজ নতুন নতুন খবর পাওয়ার আশায় খবরের কাগজের জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন। জাপান সম্বন্ধে কিছু বই কিনে পড়লেন ও দেশের ইতিহাস। ভাল লাগল তাঁর প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী।

জাপানের বীরত্বের কাহিনী পড়ে বালকের মনে পরাধীন দেশের ব্যথা বেশি করে বেজে উঠল। কি করে ইউরোপের শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবেন তাই নিয়ে মনে মনে

জল্পনা-কল্পনা করতেন। মনে মনে স্বপ্ন দেখতেন তিনি যেন তরবারি নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন। এমনি করে চৌদ্দটা বছর কেটে গেল জওহরলালের জীবনের।

তারপর, ১৯০৫ সালের মে মাসে পনের বছর বয়সে মা, বাবা এবং ছোট বোন বিজয়লক্ষ্মীকে নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য জওহরলাল ইংলণ্ডে রওনা হলেন।

জাতি হিসাবে আমরা পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে অদ্বিতীয়—জাত, গোত্র, বর্ণ, সম্প্রদায়ের কত রকম বেড়া আমরা নিজেদের মধ্যে তুলেছি। অতীতে এই ভেদাভেদ ভারতবর্ষকে দুর্বল করেছে। ভবিষ্যতে যদি এই ভেদাভেদের মনোভাব আমরা বর্জন করতে না পারি, তাহলে দুর্গতির অবধি থাকবে না।

—জওহরলাল

চার

লণ্ডনে পড়তে আসবার আগে ডোভার থেকে জওহর শুনলেন জাপান যুদ্ধে জিতেছে। জওহর যখন লণ্ডনে এলেন তখন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির নিয়ম অনুযায়ী তাঁর বয়স কিছু বেশীই। যা হোক, হ্যারো স্কুলে একটি জায়গা খালি ছিল বলে তিনি ভর্ত্তি হতে পারেন। মতিলাল ছেলেকে হ্যারোতে ভর্ত্তি করে ইউরোপ বেড়িয়ে ভারতে ফিরে এলেন।

লণ্ডনে এসে জওহরের দেখা হল ডাঃ এম, এ, আন্সারীর সঙ্গে। তখন তিনি যুবক। লণ্ডনের এক হাসপাতালে হাউস সার্জেনী করছেন।

মা বাবা চলে যাবার পর একা পড়লেন জওহর। জীবনে বাড়ী ছেড়ে এত দূরে এই প্রথম থাকা তাঁর। বাড়ীর কথা বেশী করে মনে পড়ে যায়। যা হোক, ক্রমে ক্রমে খাপ খেয়ে গেল বিদেশে।

ভাল ল্যাটিন জানা ছিল না তাই ভর্ত্তি হতে হল একেবারে নীচু শ্রেণীতে। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে বয়সের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে ছিলেন। সেজন্য খুব তাড়াতাড়ি উপরের শ্রেণীতে উঠতে পারলেন। লণ্ডনে থাকার সময়েই তাঁর মন রাজনীতির দিকে ঝোঁকে। ১৯০৫এর শেষের দিকে ইংলণ্ডে সাধারণ

নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনই তাঁর রাজনীতির দিকে লক্ষ্য পড়ার কারণ।

১৯০৬-৭ সালে ভারতবর্ষের সংবাদে জওহরের মন খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে। খবরের কাগজে তখন লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংহের নির্বাসন, তিলকের নাম, স্বদেশী ও বয়কটের কথা খুব লেখালেখি চলেছে। কিন্তু কার কাছেই বা মনের কথা বলবেন! আত্মীয় বা ভারতীয় বন্ধুদের সংগে দেখা না হলে ত এসব কথা জানা বা বলা যায় না। তখন চার পাঁচ জন ভারতীয় ছাত্র লণ্ডনে পড়তেন। তার মধ্যে কপূর্রতলার যুবরাজ পরমজিৎ সিং, বরদার গায়কোয়াড়ের পুত্রও ছিলেন। হ্যারোতে থাকবার সময় ক্রিকেটে যে অনুরাগ জন্মায়, তার আর এক কারণ এই গায়কোয়াড়ের ছেলে। তিনি খুব ভাল ক্রিকেট খেলতেন। বয়সে অবশ্য জওহরলালের চেয়ে তিনি বড় ছিলেন। তখন হ্যারো আর ইটনের ছেলেরা ক্রিকেট খেলত ভালই।

একটা বড় মজার ঘটনা ঘটে হ্যারোতে থাকতে। যুবরাজ পরমজিৎ সিং ছেলেদের সঙ্গে মিশতে পারতেন না মোটেই। জলের মাছ যেন ডাঙ্গায় উঠে এসেছে এমনি ভাব সর্বদা। ছেলেরাও তাই পিছনে লেগে থাকত। ভাব-ভঙ্গী নকল করে খেপাত খুব। যুবরাজও শাসাতেন যে একবার কপূর্রতলায় এদের পেলে দেখে নেবেন তিনি।

এ হেন পরমজিৎ সিংয়ের সোনা দিয়ে বাঁধান বেতের ছড়িটা একবার হারিয়ে গেল। দুপুর রাতে সে কি কাণ্ড! হোষ্টেলের

সুপারিণ্টেডেণ্ট প্রত্যেকের ঘর সেই মধ্য রাত্রে তন্ন তন্ন করে খুঁজে গেলেন। কিন্তু ছড়ি পাওয়া গেল না কোথায়ও।

অবশেষে ছড়িটা পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল পরমজিৎ সিংহের নিজের ঘরেই। হ্যারো আর ইটনের ছেলেদের লর্ডসএর মাঠে ম্যাচ খেলার পরেই। বোঝা গেল, কেউ লর্ডসের মাঠে বাবুগিরি করে ছড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে গেছে যথাস্থানে। দেশ থেকে বিদেশে এসে তাঁর যে সহজে খাপ খেয়ে গেল তার একটা বড় কারণ খেলা-ধূলা আর নানান কৌতুককর পরিবেশ। এই সময়ে বিদ্যালয়ে উপহার পাওয়া গ্যারিবল্ডীর জীবনকাহিনী পড়ে ভারত ও ইতালীর সমস্যা তাঁর কাছে যেন এক হয়ে যায়।

এমনি সব কারণে হ্যারো ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার জন্য তিনি উৎসুক হলেন। বাবাকে বুঝিয়ে মাত্র দুবছর হ্যারোতে পড়বার পর তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ঢুকলেন। বয়স তখন সতের কি আঠার। ১৯০৭ সালের শেষের দিক।

কেমব্রিজে তিন বছর ছিলেন জওহরলাল। রসায়ন, ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা ছিল তাঁর পড়ার বিষয়। কিন্তু শুধু ঐ বিষয়েই তাঁর আগ্রহ সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা বিষয় তিনি পড়তেন।

১৯০৭ সাল থেকে ভারতে বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খুব চরমে ওঠে। নেহরু এবং তাঁর ভারতীয় সতীর্থরা এখানে বসেই মনে মনে তিলকের দলভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কেমব্রিজে ভারতীয়রা একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তার নাম মজলিস। এই মজলিসে তাঁরা রাজনীতির আলোচনা করতেন। খুব লাজুক ছিলেন তখন জওহর। এখানে তিন বছরের মধ্যে লজ্জার জন্য খুব কমই তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। কলেজের বিতর্ক সভাতেও লজ্জায় বক্তৃতা দেওয়া হয় নি তাঁর। নিয়ম ছিল সময়মত একবারও বক্তৃতা না দিলে জরিমানা দিতে হবে। ভাবতে অবাক লাগে, তাও কতবার দিয়েছেন জওহরলাল।

কেমব্রিজে থাকবার সময় বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ওখানে যান। ভারতের এই তিন দিকপালের সঙ্গে লণ্ডনে প্রথম দেখা হয় জওহরের। লণ্ডনে থাকতেই সিভিল সার্ভিস পড়বেন কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সিভিল সার্ভিস পড়তে হলে তাঁকে আরো বেশ কয়েক বছর লণ্ডনে থাকতে হবে। জওহরলালের মা বাবা এত দীর্ঘকাল ছেলেকে ছেড়ে থাকতে আর রাজী হলেন না। তাই পৈত্রিক আইন ব্যবসায়ে যোগ দেওয়াই স্থির হল। ১৯১০ সালে কেমব্রিজ থেকে উপাধি নিয়ে 'ইনার টেম্পল'এ যোগ দিলেন জওহরলাল।

কেমব্রিজ থেকে পাশ করার পর দেশ ভ্রমণে বের হলেন জওহরলাল। সঙ্গে এক ইংরাজ বন্ধু। নরওয়েতে গেলেন ওঁরা। ছোটবেলায় সাঁতার কাটা অভ্যাস ছিল এলাহাবাদে। নরওয়ের নির্ঝরিণী দেখে থাকতে পারলেন না। টেবিল ঢাকার কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে চললেন স্নান করতে। সবাই অবাক্। এখানে, এই ঝর্ণায় স্নান করবেন ওঁরা।

কাছেই এক পাহাড় থেকে জল বেয়ে পড়ছে। খুব গভীর

নয়, কিন্তু তা হলেও পা পিছলে পড়ে গেলেন জওহরলাল। ভেসে চললেন স্রোতের টানে। ভাগ্যিস, ঐ ইংরাজ বন্ধু ছিলেন। নইলে সেদিন তিনি কোথায় হারিয়ে যেতেন কে জানে!

কেম্ব্রিজে যোগ দেওয়ার পাঁচ বছর বাদে, ১৯১২ সালে ব্যারিষ্টার জওহরলাল স্বদেশে ফিরে এলেন।

আমার মনে হয়, পৃথিবীকে সেবা করার প্রকৃষ্ট উপায় হল স্বদেশের সেবা করা—ব্যক্তিনির্বিশেষে সকল দেশবাসীর সেবা করা।

—জওহরলাল

পাঁচ

নেহরু যখন ভারতে ফিরে এলেন তখন এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন একটু ঝিমিয়ে পড়েছে। লোকমান্য তিলক তখন কারাগারে। ১৯১২ সালের বড়দিনে, বাঁকীপুরে জওহরলাল প্রথম কংগ্রেসে যোগ দেন। কংগ্রেসে তখন খদ্দরের প্রচলন হয় নি। ইংরাজী পোষাক ও ইংরাজী কেতাদুরস্ত লোকের আসর বসে সেখানে। যে অল্প কয়েকজন মানুষ রাজনীতি ও জনসাধারণের সেবা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করছেন, তাঁদের মধ্যে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে একজন। তাঁর তেজস্বীতায় নেহরু মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

১৯১৫ সালের কথা। সাধারণ সভায় লাজুক প্রকৃতির জওহরলাল তখন পর্যন্ত কোন বক্তৃতা করেন নি। তার ওপর বিদেশী ভাষা বলে ইংরাজীতে কিছু বলা তাঁর ইচ্ছা নয়। আবার হিন্দীতেও যে খুব দখল রয়েছে তাও নয়। এলাহাবাদে সেবার সংবাদপত্র দমননীতির নতুন আইনের প্রতিবাদে সভা ডাকা হয়েছে। সাহসে ভর করে সেই সভাতে বক্তৃতা দিতে প্রথম এগিয়ে এলেন জওহরলাল। বক্তৃতা শেষ হল। আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন সভাপতি ডাঃ তেজ বাহাদুর সপ্রু। আশীর্ব্বাদ করলেন তাঁকে।

১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে প্রথম গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হল জওহরলালের। এর আগে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তিনি শুধু শুনেছেন গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা সমাধানে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর এলাহাবাদে দেখা হয় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে। শ্রীমতী নাইডুর আবেগময়ী বক্তৃতা ও দেশাত্মবোধ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে।

ভালো কথা, ইতি মধ্যেই জওহরলাল হাইকোর্টে যোগ দিয়েছেন। অবসর সময় কাটাতে মাঝে মাঝে শিকারেও যাচ্ছেন। প্রাণীহত্যা অবশ্য ভাল লাগে না তাঁর। যতটা আনন্দ পান বেড়িয়ে বেড়াতে। লোকে তাঁকে বলত অহিংস শিকারী। তবে মোটে যে শিকার করেন নি তা নয়। কাশ্মীরে দৈবক্রমে একবার তাঁর হাতে একটা ভালুক মারা পড়ে। এর পরেই একটি ঘটনায় শিকার করা বন্ধ করে দেন। একবার একটি হরিণ শিশুকে তিনি হত্যা করেন। মৃত্যুকালে নিরীহ হরিণ শিশুর ছলোছলো চোখ তাঁর মনে গভীর বেদনার রেখা এঁকে দেয়। ফলে জীবনে আর তাঁর শিকার করা হল না।

১৯১৬ সালের বাসন্তী পঞ্চমী তিথিতে দিল্লীতে শ্রীমতী কমলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল।

ছয়

১৯১৭ সালের ১৯শে নভেম্বর জন্ম হয় প্রথম সন্তান ইন্দিরার। নানা চিন্তায় এ সময়ে জওহরলালের মন বড় উদ্বিগ্ন। সংঘর্ষমূলক রাজনীতি আইন ব্যাবসায়ীর পক্ষে ঠিক হবে না। অথচ কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। এই সময় কলকাতার বিখ্যাত আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রাসবিহারী ঘোষ অত্যন্ত স্নেহ করতেন জওহরলালকে। আইন ব্যবসায়ে কি করে উন্নতি হয় সে বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দেন রাসবিহারী। নিজের পছন্দমত একখানি আইনের বই লেখার কথাও বললেন। প্রয়োজনমত সংশোধন করে দেবেন রাসবিহারী। কিন্তু আইনের বই লেখা আর তাঁর হয় নি। তবে আইনের বই না লিখলেও জওহরলাল সাহিত্য-জগতে অমর কীর্তি রেখে গেছেন তাঁর বিখ্যাত বই 'গ্লীমসেস অফ ওয়ার্লড হিষ্ট্রী', 'আত্মজীবনী' ও কন্যা ইন্দিরাকে লেখা পত্রগুচ্ছে। এই বইগুলি শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বসাহিত্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

স্যার রাসবিহারী ভারতের জননায়ক গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। একবার মতিলালের সঙ্গে জওহরলাল সিমলায় গেছেন (১৯১৮)। অতিথি হয়েছেন স্যার রাসবিহারীর।

একদিন সন্ধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে মিঃ খাপার্দে বললেন—'গোখলে ছিলেন পুলিশের গুপ্তচর। একবার লণ্ডনে আমার পিছনে লেগেছিলেন।' মহামতি গোখলে তার কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন। স্যার রাসবিহারী খাপার্দের মুখে এ কথা শুনে রেগে গেলেন খুব। বল্লেন—গোখলে আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁর মত উন্নত হৃদয়ের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। সুতরাং তাঁর নামে কোন কথা সহ্য করব না। স্যার রাসবিহারীর এই প্রতিবাদে জওহরলালের তাঁর উপর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল।

১৯১৯ সালে রাউলাট বিল নিয়ে গোলমাল সুরু হল। অসুস্থ গান্ধীজী বড়লাটকে জানালেন তিনি যেন রাউলাট বিলে রাজী না হন। তা হল না। তখন গান্ধীজী নিখিল ভারত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণে বাধ্য হলেন। সত্যাগ্রহ সভা স্থাপন করলেন তিনি।

খবরের কাগজে এই কথা পড়ে জওহলালের মন ভারমুক্ত হল। তিনি ভাবলেন—এবার পথের সন্ধান পাওয়া গেল! সত্যাগ্রহে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি উৎসাহভরে তৈরী হতে লাগলেন। সত্যাগ্রহের পরিণাম জেলে যাওয়া। তাতেও ভয় পেলেন না তিনি। মতিলাল কিন্তু চিন্তিত হলেন। নতুন একটা কিছু নিয়ে হঠাৎ কোন কাজ করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তারপর ছেলে যদি জেলে যায়, শুতে হবে মাটির মেঝেতে। নিজে সুখশয্যা ছেড়ে মতিলাল মাটিতে শুতে আরম্ভ করলেন।

জেলে গেলে ছেলের কত ব্যথা লাগবে সহজে যাতে বুঝতে পারেন সেই চেষ্টা আর কি !

মতিলালের অনুরোধে গান্ধীজী এলেন এলাহাবাদে। আলোচনা হল তাঁর সঙ্গে। যাওয়ার আগে গান্ধীজী জওহরলালকে বলে গেলেন বাবার মনে আঘাত লাগে এমন কাজ যেন তিনি না করেন।

জওহরলাল সুখী হলেন না মোটেই। কিন্তু এমন একটি ঘটনা ঘটলো—যার ফলে শেষ পর্যন্ত সত্যাগ্রহ বন্ধ হয়ে গেল। দিল্লী ও অমৃতসরে গুলি চলল। অমৃতসর ও আহমদাবাদে জনতার আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডে পাঞ্জাবকে ভারতবর্ষ থেকে যেন আলাদা করে ফেলল। পাঞ্জাবের কোন খবর পাওয়াই দুরূহ হয়ে উঠল। পাঞ্জাবের লোকেদের খবর নেওয়া আর সাহায্য করার জন্য কংগ্রেস একটি শক্তিশালী সমিতি গড়ে তুলল এই সময়। পুলিশী নিষেধ সরে গেলে পাঞ্জাবে সব নেতারা হাজির হলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিলেন সাহায্য প্রদানের ভার। অনুসন্ধানের ভার পড়ল মতিলাল ও চিত্তরঞ্জন দাশের পরে। দেশবন্ধু দাশের উপর ভার পড়ল অমৃতসর শহরের তদন্তের। জওহরলাল হলেন তাঁর প্রধান সহকারী। এই প্রথম চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে জওহরলাল কাজ করলেন। দু'জনে মিলে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রত্যেকটি জিনিষ, প্রতিটি গলি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছেন।

পরে সেগুলি কংগ্রেস অনুসন্ধান সমিতির সাক্ষ্যে প্রকাশিত হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে জওহরলালের এই সময়ে যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে আজীবন তা অটুট ছিল। দেশবন্ধুর পত্নী বাসন্তী দেবী ভারতের স্বর্গীয় প্রধান মন্ত্রীর মায়ের মতই।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নরহত্যার সেই নায়ক ডায়ারের সঙ্গে ১৯১৯ সালের শেষে অমৃতসর থেকে দিল্লী আসবার পথে দেখা হয়েছিল জওহরলালের। এই পাঞ্জাবে অনুসন্ধান করার সময় গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেন জওহরলাল। গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতে বিশ্বাস জন্মাল জওহরলালের।

ধীরে ধীরে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি পুরোপুরি জড়িয়ে পড়লেন। দেরাদুন জেলা থেকে তাঁর বহিষ্কার তারই সূচনা। ১৯২০ সালের মে মাসে জওহরলাল অসুস্থা মা ও স্ত্রীকে নিয়ে মুসৌরী গেলেন। উঠলেন স্যাভয় হোটেলে। স্যাভয় হোটেলে তখন আফগান দেশের কয়েকজন প্রতিনিধি ছিলেন। ইংরাজ ও আফগানদের মধ্যে সে সময় সন্ধির কথা-বার্তা চলছে। তাঁরা আলাদা থাকতেন, খেতেন আলাদা—সাধারণের সঙ্গে এক ঘরে ভুলেও বসতেন না। ফলে জওহর-লালের সঙ্গে তাঁদের দেখাশুনা হত না। কিন্তু তবু ওখানকার পুলিসের বড়কর্তা এক সন্ধ্যায় এসে বললেন—জওহরলাল ওঁদের সঙ্গে যেন মেলামেশা না করেন। ভবিষ্যতের জন্যে এই প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিতে হবে। জওহরলাল এ পর্যন্ত আফগান

প্রতিনিধিদের সঙ্গে মেলামেশা করেন নি। কিন্তু অকারণে প্রতিশ্রুতি দেওয়া তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই রাজী হলেন না ওদের কথায়। ফলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অসুস্থা মা ও স্ত্রীকে একা ঐ হোটেলে রেখে তাঁকে দেরাদুন জেলা থেকে বেরিয়ে আসতে হল।

মুসৌরী ছেড়ে চলে এলেন এলাহাবাদে। সপ্তাহ দুয়েক এখানে ছিলেন। সেই সময়ে প্রতাপগড় জেলার গ্রাম থেকে প্রায় দুশো কৃষক পায়ে হেঁটে এলাহাবাদে আসে। তাদের উদ্দেশ্য—তালুকদারদের অমানুষিক অত্যাচারের দিকে নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। জমিদারেরা খাজনা নিয়ে কোন দাখিলা দেন না। ইচ্ছা হলে সহজেই প্রজাকে এঁরা উচ্ছেদ করতে পারেন। প্রজার পক্ষে কোন প্রমাণ দেওয়ার কিছু নেই। তা ছাড়া হাজার রকমের নজরানা আছে। কারও বাড়ীর বিয়ের সাহায্য, বিলেতে ছেলে পড়ানর খরচ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বাড়ীতে এলে তার খরচ, হাতি বা মোটর গাড়ী কেনার নজরানা —এইভাবে কত শত টাকা তাদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা হয়। জমিতে সারাদিন পরিশ্রম করে তারা যে ফসল করে, তা কেড়ে নেয় জমিদার। এর ওপর গোমস্তা আছে, পুলিশ আছে। না দিলে লাথি আর লাঠি পড়ে মাথায়। কারও থাকবার মত একটা খোড়ো ঘর পর্যন্তও নেই। এমনি সব নানা অত্যাচার জমিদার-তালুকদাররা করে থাকেন। কৃষকরা অনুরোধ জানাল—গ্রামে গিয়ে এ কথা সত্যি কিনা যাচাই করে দেখতে।

জওহরলাল কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে জুন মাসের অসহ্য গরমে চললেন গ্রামে। গাড়ী দিলেন ছেড়ে। পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরলেন। রাস্তার দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে দেশের নিপীড়িত কৃষকের দল। জওহরের পায়ের নীচে গরম মাটি, মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র। টুপির বদলে গামছা জড়ান মাথায়।

তিন দিন এমনিভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এলাহাবাদে ফিরলেন জওহরলাল। এই ক'দিনেই কৃষকদের দুঃখ, দুর্দ্দশায় তিনি অভিভূত। দেশের সাধারণ মানুষ কত অসহায় বুঝতে পারার ফলে কৃষক সমাজ তাঁর চিত্ত অধিকার করে নিল। তেমনি প্রতাপগড়, রায়বেরিলী ও ফৈজাবাদের কৃষক আন্দোলন জওহরলালকে দেশের মানুষের কাছে টেনে নিল। তাদের হৃদয়ে তাঁর জন্য হল আসন পাতা।

কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পর থেকে কংগ্রেসে গান্ধীযুগের প্রবর্তন হল। কংগ্রেসের রূপ গেল পাল্টে। বিলিতী পেষাকের বদলে এল খদ্দর। চরকা কাটা সুরু হল ঘরে ঘরে। ভাষা হল হিন্দুস্থানী। নয় তো যে প্রদেশে অধিবেশন হবে সেই প্রদেশের ভাষা। কলকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনের পর গান্ধীজী জওহরলালকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষের সঙ্গে। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। ওঁদের দেখে তিনি বল্লেন—এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে ব্রিটিশ শাসন নেই—এই আমার সান্ত্বনা।

কলকাতা থেকে ফেরার পথে শান্তিনিকেতনে দেখা করে

গেলেন রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের সঙ্গে। সঙ্গে অবশ্য গান্ধীজী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন এদেশেই ছিলেন না। ছিলেন বিদেশে। তার পরেও একবার শান্তিনিকেতনে যান জওহরলাল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা শান্তিনিকেতনের বাইরে কোথায়ও হয়েছিল। ইন্দিরা আর কমলাকে নিয়ে যেবার শান্তিনিকেতনে গেলেন, সেবারই কবির সঙ্গে দেখা হল তাঁর আশ্রমে। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে কবি জওহরলালকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। থাক্ সেকথা এখন। ১৯২১ সালে জওহরলালের সর্বপ্রথম রাজকারাগার থেকে আমন্ত্রণ এল।

দেশের আসল ঐশ্বর্য হল দেশের মানুষ ও তাদের গুণাগুণ। অনেক সময় দেখা গেছে মাথা গুনতির হিসাবে ছোট দেশ মাথাওয়ালা লোকেদের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছে।

—জওহরলাল

সাত

১৯২১ সালের ৬ই ডিসেম্বর পণ্ডিত মতিলাল ও জওহরলাল নেহরু জেলে গেলেন। এলাহাবাদ কংগ্রেস অফিসে বসে কাজ করছেন সেদিন জওহরলাল। একজন কেরাণী দৌড়ে এসে খবর দিল পুলিশ খানাতল্লাসী করতে এসেছে। তারা বাড়ী ঘিরেও ফেলেছে। জীবনে এ অভিজ্ঞতা প্রথম জওহরলালের। কিন্তু ভিতরে চিন্তিত হলেও বাইরে কিছু প্রকাশ হতে দিলেন না। কেরাণীটিকে বললেন একজন কেউ সঙ্গে যাক ওদের। আর সবাই নিজের নিজের কাজ করে যাও।

নিজে তখন একখানা চিঠি লিখছিলেন তিনি। লেখা শেষ করে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। বাড়ীতে আবার কি করছে পুলিশ কে জানে! আনন্দভবনে পৌঁছে দেখলেন পুলিশ সেখানেও তল্লাসী করছে। তারা এসেছে মতিলাল ও জওহরলালকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে। সেই প্রথম জেলে গেলেন জওহরলাল।

ইংলণ্ডের যুবরাজ এদেশে আসছেন সে সময়। সেজন্য কংগ্রেস আয়োজিত হরতালের বিজ্ঞাপন জওহরলাল বিলি করেছেন। এই তাঁর অপরাধ।

লক্ষ্ণৌ জেলে মতিলাল, জওহরলাল এবং তাঁর দু জন জ্ঞাতি

ভাইকে একই চালায় রাখা হল। চালাটি ছিল বিশ ফুট লম্বা আর ষোল ফুট চওড়া। জওহরলাল নিজ হাতে চালাটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতেন। তারপর বাবার ও নিজের কাপড় চোপড় কেচে দিয়ে চরকা কাটতে বসতেন। নিরক্ষর বন্দীদের হিন্দী, উর্দ্দু এবং অন্য প্রাথমিক শিক্ষাও কিছু কিছু দিতেন তিনি।

জেল থেকে জওহর সম্বন্ধে মতিলাল তাঁর ছোট মেয়ে কৃষ্ণাকে চিঠি লিখে জানান—আমার সেবার ব্যাপারে হরি এখন জওহরলালের কাছে শিক্ষা নিতে পারে। সকালে চা-পান থেকে সুরু করে রাত্তিরে শুতে যাওয়া পর্যন্ত দেখতে পাই, সব কিছু আমার জন্যে একেবারে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে পর্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। আনন্দ ভবনে ত প্রায়ই আমাকে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতে হত; আর এখানে আমাকে কখনও কোনও কিছু মুখ ফুটে চাইতে পর্যন্ত হয়নি। মামুদ মাঝে মাঝে সাহায্য করে বটে, কিন্তু আসল ভারটা জওহরকেই সামলাতে হয়। আমি যে এত অলস, আর আমার জন্যে যে জওহরের এত সময় নষ্ট হয়, এ জন্যে আমার ভারী খারাপ লাগে; জওহরের এই সময়টা আরও অনেক ভাল কাজে ব্যয়িত হতে পারত। সব কিছুই সে আগে থাকতে বুঝতে পারে; আমার জন্যে কোনও কাজই সে তুলে রেখে দেয় না। আমার মত পুত্রভাগ্য বেশী লোকের নেই।

মতিলালের মত পুত্রভাগ্য যেমন খুব কম লোকের হয়েছে; তাঁর মত বাবাও কিন্তু খুব কম ছেলে পেয়েছে। এ কথা জওহরলাল জানতেন বৈ কি!

তিনমাস পর জেল থেকে মুক্তি পেলেন জওহরলাল। মুক্তি লাভের পরই গেলেন সোজা সবরমতীতে গান্ধীজীর কাছে। গান্ধীজী তখন সবরমতী জেলে ছিলেন।

সবরমতী থেকে ফিরে শুরু হল বিদেশী কাপড় বর্জন আন্দোলন। পিকেটিং শুরু হয়ে গেল। ফলে আবার জেলে গেলেন তিনি। এবার মেয়াদ এক বছর ন মাসের।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জেল থেকে মুক্তিলাভের কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁকে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করা হল। এ বছর ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় কংগ্রেস নেতারা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলকাতার মেয়র, বিঠলভাই প্যাটেল বোম্বাই করপোরেশনের সভাপতি; সর্দ্দার বল্লভভাই আহমদাবাদের সভাপতি। এ ছাড়া আরও অনেক জায়গাতেই কংগ্রেস নেতারা সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।

প্রায় দু'বছর তিনি এই পদে ছিলেন। ১৯২৪-২৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রূপে কাজ করেন। ১৯২৬ সালে অসুস্থা স্ত্রীকে নিয়ে তের বছর বাদে সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা করলেন। ওখানেও ছিলেন প্রায় এক বছর ন মাস।

জেনেভাতে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও তাঁর গুজরাটি স্ত্রীর সঙ্গে

দেখা হয় জওহরলালের। ভারী অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন শ্যামজী। টাকার কুমীর, অথচ কৃপণের হাঁড়ি। ভারতীয়রা তাঁকে এড়িয়ে চলত। মনে করত ব্রিটিশ গুপ্তচর। শ্যামজীর স্ত্রী নিজের মৃত্যুর পরে বিলেতে গুজরাটি মেয়েদের পড়ার একটা সুবন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন।

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গেও এই সময় সুইজারল্যাণ্ডে দেখা হয় জওহরলালের। জার্মান চ্যান্সেলার বেথম্যান হল ওয়েগের লেখা একটি চিঠি, কাইজারের নিজের নাম সই করা ফটো, তিব্বতের দালাই লামার রেশমী কাপড়ে জড়ান লেখা পত্র, তা ছাড়া আরও অনেক ছবি ও চিঠিপত্র মহেন্দ্রপ্রতাপ পকেটে নিয়ে ঘুরছেন। চীনদেশে একবার তাঁর দামী কাগজপত্র শুদ্ধ হাতবাক্স হারিয়ে যায়। তাই এখন পকেটেই সব রাখছেন।

১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে ব্রুসেলসে নির্যাতিত জাতিগুলির কংগ্রেসের এক বৈঠক বসে। ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জওহরলাল সে কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করলেন।

ঐ সালের নভেম্বর মাসে জওহরলাল, কমলা নেহরু ও বিজয়লক্ষ্মীকে নিয়ে মস্কো রওনা হলেন। এ দলে ভারত থেকে মতিলালও এসে যোগ দিলেন। সোভিয়েট বিপ্লবের দশম স্মৃতিবার্ষিকীতে যোগ দিতে গেলেন তাঁরা। জওহরলালের এই প্রথম রাশিয়া দর্শন।

১৯২৭ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনের পর আবার কংগ্রেসের সম্পাদক হলেন জওহরলাল। মাদ্রাজে এই বছর প্রথম ও শেষ

রিপাবলিক্যান কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। জওহরলাল এখানেও সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে জওহরলালের যোগাযোগ হয়। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ্ অব ইণ্ডিয়ার তিনি ও সুভাষচন্দ্র দু'জনেই অন্যতম স্থাপয়িতা ছিলেন। এই সময়ে কোন একটা কারণে দু'জনেই কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি রাজী হলেন না কাউকে ছেড়ে দিতে।

সাইমন কমিশন বয়কট এ সময়কার একটা বড় ঘটনা। পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে গোলমাল খুব চরমে ওঠে। লাহোরে লালা লাজপৎ রায়কে ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী বেটন্ দিয়ে প্রহার করে। লালাজী আর তাঁর সঙ্গীরা নীরবে মার খেয়েছেন। তবু প্রতিবাদ করেন নি। আক্রমণও করেন নি। অসুস্থ লালাজী এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই মারা গেলেন। ভারতবাসীর বুকে তাঁর অবমাননা ও মৃত্যু এক দুঃসহ ব্যথা ও কলঙ্করেখা এঁকে দিয়ে গেল।

লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুতে লোকে আরও বেশী করে কমিশনকে বিদ্রূপ ও বয়কট সুরু করল। লক্ষ্ণৌতে কমিশন যাওয়ার আগে সেখানে সবাই বয়কটের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

এলাহাবাদ থেকে লক্ষ্ণৌ চলে গেলেন জওহরলাল। কমিশন লক্ষ্ণৌয়ে আসবার আগের দিনের কথা। শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ

হয়ে গেছে লক্ষ্ণৌ সহরে। ঠিক হল জনবিরল রাস্তা দিয়ে ষোল জন করে করে সবাই এগিয়ে যাবেন! প্রথম দলে থাকবেন জওহরলাল। দ্বিতীয় দলে সেবার ছিলেন গোবিন্দ বল্লভ পন্থ। দুশো গজ যেতে না যেতেই দেখলেন পঁচিশ জন অশ্বারোহী পুলিশ আসছে। তারা হাতের বেটন আর লাঠি দিয়ে স্বেচ্ছা-সেবকদের মেরে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। আত্মরক্ষার তাগিদে কেউ বা ফুটপাতে আশ্রয় নিচ্ছে, কেউ বা দোকানে পালাচ্ছে; তাতেও তাদের রেহাই নেই। সেখানেও পুলিশ পিছু পিছু যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো তখন জওহরলালের ঠিক পিছনে এসে পড়েছে। দলের লোকেরা মার খাচ্ছে। নিজের অজ্ঞাতেই জওহর-লাল গা ঢাকা দেওয়ার জন্য রাস্তার পাশের দিকে সরে গেলেন। কিন্তু সে মূহুর্তের জন্য। মনে হল, কাপুরুষের মত পালিয়ে যাওয়া কত বড় অন্যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়ালেন আগের জায়গায়! ততক্ষণে হাতের বেটন ঘোরাতে ঘোরাতে ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী এসে পড়েছেন। নিমেষে পিঠে বেটনের বাড়ি অনুভব করলেন জওহরলাল। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, মাথা ঘুরে গেল। তবু অটল, অচল তিনি। সঙ্গীদের অনেকেরই মাথা ফেটে গেছে। রক্তাক্ত দেহ! পন্থজীর দলও এসে পড়ল। মার তাঁরাও খেয়েছিলেন। যতক্ষণ না পুলিশ যাওয়ার অনুমতি দিল, তাঁরা বসে থাকলেন পথের ওপরে।

রাতেই মতিলাল নেহরুকে টেলিফোনে সব জানালেন জওহর। ভয় হয়, পাছে খবরের কাগজ পড়ে আবার মতিলাল

লক্ষ্মৌ চলে আসেন। কিন্তু তাই-ই হল। খবর পেয়ে সেই রাতেই মোটরে করে মতিলাল চলে এলেন এলাহাবাদ থেকে। লক্ষ্মৌ পৌঁছলেন ভোর পাঁচটায়। পথ ত কম নয়। ১৪৬ মাইল রাস্তা। তবু একমাত্র সন্তান পুলিশের হাতে মার খেয়েছে জেনে মতিলাল স্থির থাকেন কি করে!

পরদিন ভোরের কথা। সারা সহরের লোক ছুটে চলেছে লক্ষ্মৌ ষ্টেশনের দিকে। প্রধান মিছিল বের হল কংগ্রেস ভবন থেকে; সে মিছিল চার জন চার জন করে কয়েক হাজার মানুষের। এখন যেখানে নতুন ষ্টেশন, তখন সেখানে খোলা মাঠ ছিল! পুলিশের কাছে তার আগেই বাধা পেল মিছিল। এবারও যথারীতি জওহরলাল পুরোভাগে। হঠাৎ দেখা গেল জনতা মাটিতে পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। যন্ত্রণায় ছুটে পালাতেও তারা পারছে না। কিছু ভাববার আগেই দু'তিন দলে বিভক্ত অশ্বারোহী সৈন্য ছুটে এল তাঁদের দিকে। পদাতিক পুলিশও ছিল। লাঠি ও বেটনের বাড়ি শুরু হয়ে গেল। সে যে কি কাণ্ড চোখে না দেখলে কল্পনাও করা যায় না। অন্তত স্বাধীন দেশে যারা জন্মেছে তারা বুঝতে পারবে না। নিরীহ জনতা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে নীরবে সেই অমানুষিক প্রহার সহ্য করেছে। জওহরলাল চোখে অন্ধকার দেখলেন। কিন্তু সেই প্রচণ্ড মার খেতে খেতেও মনে হল যে তিনি কোথাও পালিয়ে যাবেন না। প্রতিবাদও করবেন না। যদি এতগুলি মানুষ একযোগে প্রতিবাদ জানান তবে গুলি চালিয়েই মেরে ফেলে দেবে পুলিশ।

লাঠির আঘাতে হঠাৎ এক সময় মনে হল তাঁর যে তিনি যেন শূন্যে উঠে যাচ্ছেন। আসলে বন্ধুরা তাঁকে নীরবে মার খেতে দেখে তুলে ধরে পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শোভাযাত্রীরা একশ ফুট পিছনে সরে সারিবদ্ধ হয়ে বসল আবার। দেহের আঘাত বন্দিনী মায়ের বন্ধনদশা দেশের মানুষকে সেদিন আরও বেশী করে বুঝিয়ে দিল। পরাধীনতার বেদনা ভাল করে অনুভব করলেন জওহরলাল।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে তিনি প্রথম কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনেই পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ নেওয়া হয়। মোট ছয় বার জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। স্বাধীনতা লাভের আগে তিন বার। পরে ১৯৫১-৫৪ সালের মধ্যে আরও তিন বার তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

প্রথমবার যখন সভাপতি হন অনেকে অভিনন্দন জানান। তার মধ্যে সরোজিনী নাইডুও ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে জওহরলালকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন—

প্রিয় জওহরলাল,

সারা ভারতবর্ষে গতকাল বোধ হয় কেউ তোমার বাবার চাইতে বেশী গর্বিত অথবা তোমার চাইতে বেশী ভারাক্রান্ত বোধ করেনি।……অসংখ্য অভিনন্দনে সেদিন আনন্দভবন ভরে যায়।

জেলে যে কতবার গেছেন তার লেখা-জোখা নেই। তার মধ্যে ১৯৩০-৩৫ সালে লবণ আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের

জন্য বেশ কয়েকবার জেলে যান। ইতিমধ্যে তাঁর বাবা মতিলাল নেহরুর মৃত্যু হয়েছে।

১৯৩৪ সালে বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। সেখানে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে জওহরলাল সেবা কার্যে যোগ দেন। ১১ই ফেব্রুয়ারী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে এলাহাবাদে ফিরে এলেন। পরদিন বিকালে স্ত্রীর সঙ্গে চা-পানের সময় আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। একজন পুলিশ কর্মচারী এসে সেই সময় বললেন, 'আপনার জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছি।'

কর্মচারীটি বললেন তিনি খুব দুঃখিত। কিন্তু কি করবেন। কলকাতা থেকে পরোয়ানা এসেছে।

এবার কলকাতার আলিপুর জেল। বিখ্যাত লাল বাজার পুলিশ ঘাঁটি। প্রেসিডেন্সী জেল। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট। বিচারে দু'বছরের জেল হল। এই নিয়ে সাত বার কারাগারে এলেন জওহরলাল।

আলিপুরে ১০ ফুট লম্বা ৯ ফুট চওড়া একটা সেলে রাখা হল তাঁকে। সামনে ছোট বারান্দা আর একটা চিলতে উঠোন। উঠোন আবার সাত ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সেল আর উঠোনের সামনে রান্নাঘরের দু'টো চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বের হত। তাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম। রাত্রেও শান্তি পাওয়া যেত না। অনবরত শান্ত্রীরা যেত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাদের তদারকিতে ঘুম চলে যেত ছুটে। সময় সময় আবার হ্যারিকেন নিয়ে দেখত কেউ পালিয়ে গেল কিনা। তার উপর রাত তিনটের

সময় বাসন মাজার তুমুল শব্দে শোওয়া আর হত না। খবরের কাগজও দেওয়া হত না তাঁকে। আপন মনে লেখাপড়া করতে করতে একসময় চোখে পড়ত পাশের ইয়ার্ডের একটা কি দুটো গাছের মাথা। যখন জেলে প্রথম এলেন, তখন পাতা বা ফুল ছিল না তাতে। ডালগুলি রিক্ত। তারপর একসময় কচি শাখায় ভরে গেল ডাল পালা। চিল বাসা করেছিল একটি গাছে। বাচ্চা হল তার। তারা আবার আস্তে আস্তে বড় হল। কী অব্যর্থ লক্ষ্য তাদের। ছোঁ মেরে কয়েদীদের হাত থেকে রুটি নিয়ে পালিয়ে যেত। ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে এই সব তিনি লক্ষ্য করতেন। যখন ঐ সব দেখে বিরক্ত লাগত, তখন নিজের প্রিয় ব্যায়াম করতে বসতেন তিনি। শরীর সম্বন্ধে বরাবরই সজাগ দৃষ্টি ছিল তাঁর। জেলের মধ্যেও কখনও ভুল হয়নি এ বিষয়ে।

তাঁকে এবার ধরে আনা হয়েছিল বাংলাদেশে বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে। তাতে খুসী হয়েছিলেন জওহরলাল। রাজদ্রোহী ত তিনি অনেক আগে থেকেই। কিন্তু বাংলাদেশে বক্তৃতা দিয়ে বাংলাদেশেই বন্দী জীবন তাঁকে বাঙ্গালীর বড় কাছাকাছি এনে দেয়। তিনি নিজেই বলেছেন—বাংলা সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ আমার বিরুদ্ধে এই মামলা এনে বাংলা সরকার আমাকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। বাংলা ও আমি আজ একাত্মা। বাংলার অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে আমি যুক্ত। বাংলার মানুষের সঙ্গে আজ আমার ভাগ্যও মিশে গেল। এ আমার গৌরব। এ গৌরব আমি চিরকাল বহন করব।

বাংলাদেশের মানুষও তাঁকে ভালবাসত। কথা শুনত। সে প্রমাণ মিলে গেল একবার। কলকাতার ওয়েলিংটনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিং। ভীষণ গোলমাল হচ্ছে কোন একটি ব্যাপারে। প্যাণ্ডেলের বাঙ্গালী দর্শকরা ক্ষেপে গেছে সেদিন সর্ব-ভারতীয় নেতাদের উপর। সমস্ত গাড়ী, ঘোড়া বন্ধ করে দিয়েছে। জনতা দারুণভাবে উত্তেজিত। কারও সাহস হচ্ছে না সামনে যাওয়ার। কোনক্রমে পালিয়ে সামনে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে ঢুকে যদি আত্মরক্ষা করতে পারেন—এই চেষ্টাই সবার।

এমনি যখন অবস্থা—সেই মারমুখী জনতার সামনে লরীতে উঠে দাঁড়ালেন জওহরলাল। আজকের নেতা জওহর নন, কর্মী জওহর। দু'হাত উঁচু করে ডাক দিলেন জনতাকে। 'শুনিয়ে—থোড়া শান্ত হো যাইয়ে—শুনিয়ে—'। সে ডাকের পর আর একটিও ইঁট উঠল না। একটি গালাগালিও দিল না কেউ। মুহূর্তে সব শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ভাবীকালের নেতা জওহরকে এমনই শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত বাংলাদেশের মানুষ।

জওহর যখন কলকাতায়, তখন আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন কমলা নেহরু। স্ত্রীকে দেখতে কয়েক দিনের জন্য মুক্তি পেলেন। কিন্তু এরই মধ্যে সরকার বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে আবার তাঁকে বন্দী করা হল। 'গ্লীমসেস অব ওয়ার্লড হিষ্ট্রী' বইটি তখনই প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫ সালে আলমোড়া জেলে থাকতে তাঁর আত্মজীবনী লেখা শেষ হল। বিদেশ থেকে খবর এল স্ত্রীর অসুস্থতা বেড়েছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় মুক্তিলাভ করে ইন্দিরাকে নিয়ে রওনা হলেন সুইজারল্যাণ্ডে।

১৯৩৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী সুইজারল্যাণ্ডের লোজানে মৃত্যু হল স্ত্রী কমলার। ঘুরে বেড়ালেন রোম ও লণ্ডনে। কিন্তু বেশী দিনের জন্য ঘোরার অবকাশ হল না তাঁর। লক্ষ্ণৌয়ে ৪৯তম কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে ডাক এল। সভাপতিত্ব করতে হবে। নির্বাচনী প্রচারের জন্য ঘুরে বেড়ালেন সারা ভারতবর্ষ। ২৬শে ডিসেম্বর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ফৈজাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন।

বাবা ত মারা গিয়েছিলেন অনেক আগেই। ১৯৩১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। পরে গেলেন স্ত্রী। এবার যাওয়ার পালা এল তাঁর মায়ের। ঘরে আর কতটুকু থাকতে পেরেছেন। তবু সান্ত্বনা ছিল সেখানে মা আছেন। হোন না অসুস্থা, তাতে কি আসে যায়। কিন্তু রাখা গেলনা তাঁকে। ১৯৩৮ সালে স্বরূপরাণী মারা গেলেন। একেবারে একা হয়ে পড়লেন জওহরলাল। শুধু সম্বল মেয়ে ইন্দিরা। কথায় আছে, ভগবান তার ভক্তের সব অবলম্বন কেড়ে নেন। এ-ও হল তাই। দেশজননী বন্ধনমুক্ত করলেন তাঁর প্রিয় সন্তানকে। সংসারে যদি মায়া থাকে, তবে এমন করে ঘরছাড়া হয়ে দেশের সেবা করবেন কি করে তিনি!

মায়ের মৃত্যুতেও তাই মুষড়ে পড়লেন না। বরং পুরোদমে দেশের কাজে নামলেন জওহরলাল। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করলেন। স্পেনে চলেছিল গৃহযুদ্ধ।

একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম চলেছে স্পেনে তখন। ছুটে গেলেন স্পেন দেশ ঘুরে দেখতে। ক্লান্তি নেই কিছুতেই।

চীন দেশটাকেও দেখে এলেন একবার। সালটা হচ্ছে ১৯৩৯। ঠিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখোমুখি।

১৯৪০ সালে আবার জেলের ফটকে আটক পড়লেন। কারণ—ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ। এক দু'দিন নয়, চার চার বছরের মেয়াদে গেলেন জেলে। একেবারে সশ্রম কারাবাস। কিন্তু মুক্তি পেলেন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরেই।

১৯৪২ সালে ভারতে এলেন চিয়াং কাইশেক। দেশের কথা আলাপ করলেন তাঁর সাথে। সেবার ইংল্যাণ্ড থেকে ব্রিটিশরা স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে দূত করে পাঠায়। উদ্দেশ্য ভারতের সমস্যার কথা আলোচনা। তাঁর সঙ্গে মতে মিল হল না নেতাদের। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সবাই 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব তুললেন। সারা ভারতে তখন ঐ এক বুলি সবার মুখে—ইংরাজ ভারত ছাড়। ৮ই আগষ্ট গান্ধীজী ও অন্য কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। সেই সঙ্গে বন্দী হলেন জওহরও। এলেন আমেদাবাদ জেলে।

জওহরলালের লেখা বিখ্যাত বই 'ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া' এই জেলে বসেই লিখতে শুরু করেন। ১৯৪৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী জেল থেকে মুক্তি পেলেন জওহরলাল। সিমলাতে ডেকে পাঠালেন তখনকার সরকারী মহল। বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনার জন্য সেখানে গেলেন জওহরলাল।

এই সময়ে আর এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা থেকে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তারপর দেশের লোক অবাক হয়ে হঠাৎ জানতে পারল—নেতাজী গড়ে তুলেছেন এক মুক্তি ফৌজ। তার নাম 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'। এই বাহিনী যুদ্ধ করে ইংরাজদের পরাস্ত করতে করতে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে তারা পারে না। তার পিছনে রয়েছে অবশ্য অন্য কারণ। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বন্দী করে নিয়ে আসে ব্রিটিশ সরকার। বিচার চলে লালকেল্লায় ১৯৪৫ সালে। এই বিচারে আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষ সমর্থন করলেন জওহরলাল। না, শুধু মুখের কথায় নয়। বহুকাল বাদে তুলে রাখা গাউন গায়ে চাপিয়ে ব্যারিষ্টার জওহরলাল লালকেল্লায় গেলেন। সেই ঐতিহাসিক বিচারে প্রবীন আইনজ্ঞ ডাঃ তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও ভুলাভাই দেশাইয়ের পাশাপাশি বসলেন—তাঁদের চেয়ে নবীন আইনজীবী জওহরলাল।

আইনজীবী হিসাবে জীবন কাটিয়ে দিলে তিনি যে কত নাম করতেন সে প্রমাণ পেলেন দেশের মানুষ। দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ—এ দেশদ্রোহিতা নয়। রাজদ্রোহ ত নয়ই। চিরকালের এই সত্য মেনে নিলেন ইংরাজ বিচারক। মুক্তি পেলেন সসম্মানে সব সেনানীরাই।

অনেক দিন বাইরে যান নি জওহরলাল। এবার তাই পাড়ি জমালেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে। বেশী দিনের জন্য নয়

যদিও। ১৯৪৬ সালে বড়লাট অনুরোধ করলেন স্বাধীনতা লাভের আগে যে সরকার গঠন করা হচ্ছে, তাতে তাঁকে উপ-সভাপতির পদ গ্রহণ করতে। রাজী হলেন জওহরলাল।

পথ তখনও হাতছানি দিচ্ছে। অক্টোবর মাসে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গেলেন বেড়াতে। ডিসেম্বর মাসে যেতে হল বিলাতে। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে। গণপরিষদে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিলেন।

১৯৪৭ সালের ৩রা জানুয়ারী দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। শিশু জওহর ছোট্ট বেলায় ল্যাবরেটারী করে তাতে সভাপতিত্ব করতেন। এবার করলেন এখানে। এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে। বিজ্ঞানে তাঁর প্রীতির পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে স্বাধীন ভারতের নতুন নতুন জাতীয় কারিগরি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল, ভারতবর্ষ দুটি দেশে বিভক্ত হয়ে গেল। ব্রিটিশেরই কুটিল চক্রান্তে একই মায়ের দুটি সন্তান হয়ে গেল পৃথক। গান্ধীজীর স্বপ্ন সার্থক করে জওহরলাল ভারতবর্ষে প্রথম প্রধান মন্ত্রী হলেন। মহাত্মা গান্ধী বলতেন—তাঁর ভাবধারার সার্থক বাহক জওহরলাল। জওহরের নেতৃত্বে রূপ পাবে তাঁরই কল্পনা—সব স্বপ্ন, সব আশা মূর্ত হবে জওহরের ভাষায়। তাই হল এবার।

আট

গান্ধীজীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বর্তাল জওহরলালের উপর। কর্মী জওহর, নেতা জওহর প্রধান মন্ত্রীরূপে শপথ নিলেন। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের মানুষের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের হাতে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে পর্যন্ত একটানা সতের বছর এই কঠিন কর্তব্য তিনি পালন করে গেছেন। অবসর মেলে নি জীবনে। সেই কতকাল আগে গান্ধীজী মতিলালকে বলেছিলেন জওহরের একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত, সে বিশ্রাম মিলল তাঁর একেবারে। মৃত্যুর হিম শীতল পরশে।

জওহরলালের প্রধান মন্ত্রীত্ব কালের সর্ব প্রধান কীর্তি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির রূপদান। নব ভারতের তিনি ছিলেন নবীন রূপকার। দেশ যখন পরাধীন, তখন থেকেই তিনি ভাবতেন কিসে ভারতের উন্নতি হবে। কোন্ পথে, কি উপায়ে ভারতের সমৃদ্ধি আসবে।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। তাঁর নিজের উৎসাহ ও দূরদর্শিতার জন্যই ভারতে পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি ছিলেন তিনি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীও শেষ হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রায় শেষের মুখে।

তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী, তখনকার কয়েকটি বিশেষ দিন চিরকাল স্মরণীয় হয়ে রইল ভারতের ইতিহাসে। ১৯৪৮ সালের ১২ই এপ্রিল হীরাকুঁদ বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। উদ্বোধন করলেন এশিয়া ও দূর প্রাচ্য সম্পর্কিত তৃতীয় বৈঠকের। বিশে আগষ্ট পারমানবিক কমিশনের প্রথম বৈঠকে ভাষণ দেন।

পরিকল্পনাগুলির মধ্যে বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান মেশিন টুলস কারখানা, নাগার্জ্জুন সাগর পরিকল্পনা, জব্বলপুরে ট্রাক নির্মান কারখানা, ১৯৬১ সালের ১৬ই জানুয়ারী বোম্বাইয়ে কানাডা-ভারত পারমানবিক রিয়েকটের উদ্বোধন করেন। আসামের নুনমাটি তৈল শোধনাগার; ভারতে নিশান গাড়ী তৈয়ারী কারখানা, চিত্তরঞ্জনে প্রথম বিদ্যুৎচালিত রেল ইঞ্জিন 'লোকমান্যে'র উদ্বোধন; ১৯৬৩ সালে ভাক্রা বাঁধের উদ্বোধন; ১৯৬৪ সালের মে মাসে কোশী ও গণ্ডক পরিকল্পনার উদ্বোধন তিনি করে গেছেন।

বিদেশের সঙ্গে তাঁর নীতি—প্রীতি ও সহযোগিতার। ভারত সেখানে এক নতুন আদর্শ তুলে ধরেছে। সব বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও জোট নিরপেক্ষভাবে ভারতকে তিনি চলতে শেখালেন!

পঞ্চশীল আদর্শের তিনি পুরোধা। তাঁর এই নীতি পরবর্তী কালে বান্দুং সম্মেলনে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলির সমাদর লাভ করে।

প্রাচীন ইতিহাসের পাতা থেকে যা কিছু ভাল, যা আদর্শ তিনি সংগ্রহ করে আনলেন আধুনিক ভারতের ইতিহাসে। 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই মন্ত্রের যিনি প্রচারক, সেই ভগবান তথাগতের ধর্ম তিনি আবার প্রচার করলেন তাঁর সহযোগিতার মন্ত্র দিয়ে।

বুদ্ধভক্ত সম্রাট অশোকের মত গান্ধীশিষ্য জওহরলাল তাঁর রাষ্ট্রের জন্য বহন করে নিয়ে এলেন সম্রাট অশোকের ঐতিহ্য-মণ্ডিত অশোকচক্র।

ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী। দেশ বিদেশের কূটনীতিবিদরা এখানে বাস করেন। তাঁরা যেখানে থাকেন, সে এলাকায় নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সব বুদ্ধিমান মানুষে ভরপুর। সেই এলাকার নাম রাখা হয়েছে চাণক্যপুরী। মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের বিচক্ষণ মন্ত্রী চাণক্যের নাম অনুসারেই।

শুধু নিজেরে দেশের লোকের জন্য তাঁর চিন্তা ছিল, তাই নয়। পৃথিবীর সব দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের, পরাধীন জাতির কথাই তিনি চিন্তা করতেন। সারা পৃথিবী তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। সমস্ত দেশেই শান্তি স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছেন। ১৯৪৮, ১৯৫৬ এবং ১৯৬১ সালের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে তিনি পৃথিবীর বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলে দেবার জন্য আহ্বান জানান। ছোট্টবেলা থেকে যে মহান্ আদর্শের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন,—এ বাণী সেই স্বপ্নের।

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় দলের নেতা হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জওহরলাল যোগ দেন। এই সম্মেলনে আমেরিকার পূর্বতন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার আর রাশিয়ার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভকে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠার আবেদন করেন। শুধু এই অধিবেশনেই নয়, ১৯৬১ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরের বেলগ্রেডে যে নিরপেক্ষ সম্মেলন হয়, তাতেও তিনি এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থানের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট দিত। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ভারত ও পাকিস্থান—এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেছেন।

চীন ছিল এককালে বন্ধুরাষ্ট্র। স্বাধীনতা লাভের আগে থেকেই তিনি চীন দেশকে সাহায্য করে এসেছেন। জাপান যখন চীন আক্রমণ করেছিল, তিনি নিজে ছুটে গেছেন চীনে। দেখে এসেছেন, সেখানকার মানুষের দুর্দশা। এই চীন দেশের ভার যখন নতুন শাসক গোষ্ঠীর হাতে এল, তখন ভারতবর্ষই প্রথম রাষ্ট্র যে চীনকে স্বীকৃতি দান করে। শুধু ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর মানুষ যাতে চীনের মানুষকে বিশ্বাস করে, সে চেষ্টাও তিনি করলেন। বান্দুংএ আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীতে তাঁর চেষ্টাতেই চীন দেশ ঠাঁই পায়। ১৯৫৪ সালে চৌ-এন লাইয়ের সঙ্গে এক সাথে তিনি পঞ্চশীলের নীতিতে স্বাক্ষর করেন।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীন যখন ভারত আক্রমণ করে চীনের দুর্দিনের বন্ধু জওহরলাল সত্যিকার দুঃখ পেলেন সেদিন।

সুয়েজ খাল নিয়ে গোলমাল শুরু হল। তার এক দিকে ব্রিটিশ অন্য দিকে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের। সেদিনও নীতি ঠিক করতে এতটুকুও দ্বিধা করেননি আমাদের প্রধান মন্ত্রী। তাঁর কঠোর সমালোচনায় ইংরাজ সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রসংঘের কাছে জরুরী তার চলে গেল। তাঁরা যেন অবিলম্বে এই সঙ্কটে হস্তক্ষেপ করেন।

পরাধীন দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনে জওহরলাল সর্বদাই সবার আগে শুভ কামনা জানিয়েছেন।

নিজের দেশের হাজার রকম কাজের মধ্যেও বিদেশ ভ্রমণ তাঁর বাদ পড়ে নি। বার বার আহ্বান এসেছে—পৃথিবীর নানা দিক থেকে। ছুটে গেছেন সর্বত্র, বুকে আধফোটা রক্তগোলাপ, মুখে শ্বেতশুভ্র অভয় বাণী।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আমন্ত্রণ করেন ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে। সেখানে ১৩ই অক্টোবর মার্কিন কংগ্রেসে ভাষণ দিলেন। পরদিন ১৪ই দিলেন কানাডায়। আমেরিকার মানুষ সহজে কি ভুলবে সেই ঐতিহাসিক ভাষণের কথা!

১৯৫৬ আর ১৯৬১ সালে আবার গেলেন আমেরিকায়।

সোভিয়েট রাশিয়া ঘুরে এলেন দুবার। প্রথমবার গেলেন ১৯৫৫তে, দ্বিতীয়বার—১৯৬১ সালে।

১৯৫৬ সালে গিয়েছিলেন পুরানো বন্ধুরাষ্ট্র চীনে।

প্রতিবেশী রাজ্য নেপালের সঙ্গে নতুন করে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠলো। ভারতের সঙ্গে নেপালের যে অতীতের যোগ রয়েছে, সে বাঁধন ছাড়িয়ে ফেলার নয়। এই পুরানো সত্য নতুন করে উপলব্ধি করলেন সবাই। সে চেষ্টাও ত জওহরের। ১৯৫১ এবং ১৯৫৯ সালে তাঁর নেপাল সফরের পরেই সম্ভব হল আবার এ কথা ভাববার।

ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেক হয় ১৯৫৩ সালের মে মাসে। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রী।

১৯৫৪ সালে প্রাচ্য মহাদেশ পরিভ্রমণ করেন। ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় ঘুরে এলেন তিনি।

মিশর, ইটালি, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া আবার ঘুরে এলেন। ১৯৫৫ সালের জুন-জুলাই মাসে।

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসের আট তারিখে মহামান্য পোপের সঙ্গে তিনি দেখা করে এলেন। ১৩ই ডিসেম্বর তখনকার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বুলগানিনের সঙ্গে একযোগে সহ-অবস্থানের যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন।

বিশ্রাম নেই। শুধু কাজ, আর কাজ। আবার আয়ার্লাণ্ড, পূর্ব জার্মাণী, ফ্রান্স, যুগোশ্লোভিয়া, গ্রীস, মিশর, সিরিয়া ও লেবানান ঘুরে এলেন (জুন-জুলাই, ১৯৫৬)।

১৯৫৭ সালের জুন মাসে ফের বেরিয়ে পড়লেন শুভেচ্ছা

সফরে। এবার গন্তব্যস্থল সিরিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে আর সুইডেন। পরের মাসে গেলেন মিশর, হল্যাণ্ড আর সুদানে।

১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে গেলেন জাপান সফরে।

১৯৫৯ সালের ১১ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ও জওহরলাল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল বিরোধ মীমাংসার জন্য যুক্ত বিবৃতি দিলেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা প্রধান মন্ত্রীত্ব কালে হয়নি। প্রথম যৌবন থেকেই তিনি বিদেশে ভারতের বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন। সেই কতকাল আগে ব্রুসেলস-সম্মেলনে প্রথম দেখা হয় রেঁামা রোঁল্যা এবং আইনষ্টাইনের সঙ্গে। সে বন্ধুত্ব কোনদিন হারিয়ে যায় নি জীবনের পথে।

তেমনি যা অপছন্দ করতেন, চিরদিন তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। কোন সঙ্কোচ তাতে নেই। ঘৃণা করতেন ফ্যাসীবাদ, একনায়কত্ব। সেই কারণেই ১৯৩৬ সালে যখন তিনি ইটালীতে, রোমে দেখা করতে চাইলেন ইটালীর মুসোলিনী, কিছুতেই রাজী হলেন না জওহরলাল। দেখা না করেই চলে এলেন তিনি।

১৯৬১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর পর্যন্ত জাতীয় সংহতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতির সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখতে এই সম্মেলনকে সবাই স্বাগত জানান। এই সম্মেলনের তিনিই ছিলেন কেন্দ্রমণি।

১৯৬২ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে

ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। ঐক্যবদ্ধ হতে বললেন দেশের মানুষকে। শিয়রে চীনা শত্রু দাঁড়িয়ে। সজাগ হও সবাই।

দেশের জন্য তাঁর সেবা এবং সমগ্র মানব জাতির শান্তির জন্য তাঁর চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ভারতমাতার জওহর প্রধান মন্ত্রী জওহরলালকে ১৯৫৫ সালের ১৫ই জুলাই 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্রধান মন্ত্রীত্বের কাজের ফাঁকে অবসর মিলত না মোটেই। তবু যতদূর সম্ভব ছকে বাঁধা জীবন কাটাতে ভালবাসতেন তিনি। সকাল সাড়ে ছ'টায় ঘুম থেকে উঠতেন। ঘুম থেকে উঠে মিনিট কুড়ি ধরে করতেন যৌগিক ব্যায়াম। ব্যায়াম করে উঠে সেদিনকার খবরের কাগজগুলিতে চোখ বুলিয়ে নিতেন। সকাল আটটায় লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে আগের রাতে আসা খবরগুলি দেখতেন। যাতে সই দেওয়ার দরকার করে দিতেন। বেলা সাড়ে আটটায় হত সকালের খাবার খাওয়া। ঠিক ন'টার সময় যারা দেখা করতে আসত, তাদের সঙ্গে দেখা করতেন। বেলা পৌনে এগারটা পর্যন্ত পররাষ্ট্র দপ্তরের কাজকর্ম দেখতেন। সেখান থেকে এগারটায় লোকসভা ভবনে। কাজের অন্ত থাকত না সেখানে। ছিল লোকসভার কাজ, মন্ত্রীমণ্ডলীর সভা। কম করে ত্রিশ চল্লিশ জন লোক এখানেও দেখা করতে আসত। বেলা দেড়টায় দুপুরের খাওয়ার সময় মিলত তাঁর। যদি সুযোগ হত তবে আধঘণ্টার মত বিশ্রাম করতেন তিনি। সেও কি সব দিন হত। তারপর আবার রাত সাতটা অবধি একনাগাড়ে কাজ।

অতিথি আপ্যায়ন করতে হলে রাতেই করতে হত। এর পরে দিতেন ডিক্‌টেশান। সেও চলত রাত সাড়ে বারোটা অবধি। খাওয়ার পরে বিশ্রাম নেই। ডিক্‌টেশান শেষ করে দেখতেন নানা রিপোর্টপত্র। তা ছাড়া নিজের নেশা ত রয়েছেই। পড়তেন সময়িক পত্র-পত্রিকা। ঘরের আলো নিভতে নিভতে রাত দেড়টা বাজতো বৈকি!

মোটামুটি এই ছকেই দৈনন্দিন কাজ করে গেছেন তিনি। সুস্থও ছিলেন ১৯৫৮ সাল, অর্থাৎ ৬৮ বছর বয়স অবধি। প্রথম ছন্দ পতন ঘটে সেই বছর। ভাবছিলেন ছেড়ে দেবেন প্রধান মন্ত্রীর পদ। কিন্তু ছাড়তে দিল কৈ দেশের লোক!

তাই, মৃত্যু যে থাবা ১৯৫৮ সালে প্রথম বাড়িয়েও তাঁকে নিয়ে যেতে পারে নি, সেই থাবা আবার বাড়ালো ১৯৬৪ সালে ২৭শে মে সকালে। এবার আর নিষ্ফল হয়ে ফেরে নি। বেলা দুটোর সময় সে সিদ্ধিলাভ করল। ছিনিয়ে নিয়ে গেল ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন জওহরকে।

ভারতের সমস্ত লোক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক মন, এক প্রাণ হোক। ধর্মের, বর্ণের, জাতের সম্প্রদায়ের—সব রকম কৃত্রিম ব্যবধান দূর হয়ে যাক্।

—জওহরলাল

পরিশিষ্ট

অনেক কাল আগে। তাঁর বাবা মতিলাল তখনও বেঁচে। তখন তাঁর জন্মদিন সারা ভারতে 'জওহর দিবস' রূপে উদযাপিত হত। প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তাঁর জন্মদিন ভারতবর্ষে 'শিশুদিবস'রূপে পরিচিত। গ্রামে, গ্রামে, ক্লাবে, ক্লাবে এ দিন শিশুদের আনন্দরোল ওঠে। নেহরু-জন্মদিন বেঁচে থাকবে চিরদিন শিশুদের মাঝে।

হাজার রকমের কাজকর্ম থাকত। তবুও শিশুদিবসে চাচা নেহরুকে রাজ্যের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধূলো আর নাচেগানে মেতে উঠতে দেখা গেছে। হাসি আর কৌতুকের অজস্র ফোয়ারায় নতুন করে স্নান করে উঠতেন তিনি সেদিন।

শান্তিনিকেতনে প্রতিবার বার্ষিক তীর্থযাত্রায় যেতেন তিনি। মৃণালিনী পাঠশালার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেতে উঠতেন হৈ-চৈতে। বালিশ ছুঁড়ে মারছেন কখনও। আবার কখনও দেখা গেছে নাগরদোলায় ঘূর্ণিপাকে দোদুল-দুল দোল খাচ্ছেন। সঙ্গী শিশুদের মত তাঁর হাতেও কঞ্চির লাঠি, মাথায় বেতের টুপি। পুলিশরা ত কাণ্ড দেখে শীতের দিনে ঘেমে নেয়ে উঠত।

ছোটদের সঙ্গে মজলিশ জমতে একটুও দেরী হত না তাঁর। প্রত্যেক বছর তিনি যখন শান্তিনিকেতনে আসতেন, আনন্দ-

মেলার ব্যবস্থা থাকত পাঠশালায়। তিনি তাদের সঙ্গে খেলতেন বল নিয়ে, কমলা লেবু ছুঁড়ে দিয়ে। বিস্কুটও ছুঁড়ে দিতেন ওদের। কত রকম যে উৎসব হত তার ঠিক নেই।

এই শান্তিনিকেতনেই। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়কে কি একটা পড়তে দিলেন। অতএব চশমা পরতে হল তাঁকে। তিনি যেই চশমা বের করতে খাপটি খুলেছেন, দেখা গেল কতকগুলো কি টুকরো কাগজ সেখানে উঁকি দিচ্ছে। শ্রীমতী নাইডু প্রশ্ন করেন—একি, কাগজ কেন চশমার খাপে। উপাচার্য মশাই জানালেন, —না, কাগজ নয়। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের জন্য পুরানো ডাকটিকিট রেখেছি।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন জওহরলাল। উপাচার্য মহাশয়ের কাণ্ড দেখে বললেন—আমার কাছে ত দেশবিদেশের বহু ডাক-টিকিট আসে। ছেলেমেয়েদের জন্য আমিই ত পাঠিয়ে দিতে পারি। আমি এবার থেকে তাই করব।

সবাই ভেবেছিলেন এটা নেহাৎ কথার কথা। কারণ এত কাজের মধ্যে তাঁর একথা মনে থাকবে কেউ কি ভাবতে পারে! কিন্তু তাই হয়েছিল। শুধু সেবার ফিরেই তিনি ডাকটিকিট পাঠান তা নয়। যতদিন বেঁচে ছিলেন, প্রত্যেক মাসেই উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশের নামে একটি করে ডাকটিকিটে ভর্তি খাম এসে পৌঁছাত। তার মধ্যে কত রকম টিকিটই যে থাকত।

এমনি সব ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে জওহরলালের সহজ,

সুন্দর মনের পরিচয় মিলেছে। চিরদিনই তিনি এমনি সহজ মনের মানুষ। অতীতের একটি কথা মনে পড়ে যায়। সবে ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে এসেছেন জওহরলাল। সাইকেল চেপে বেরিয়েছিলেন কি কাজে। ফিরে বাড়ীর কাছে এসে দেখেন তাঁর মত বহু ছেলেরা সেখানে ভীড় জমিয়েছে। হাতে তাদের ছোট ছোট ফেষ্টুন। বুন্দেলখণ্ডের দুর্ভিক্ষপীড়িত অধিবাসীদের জন্য ওরা সাহায্য চাইতে এসেছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কাছেও ওরা এসেছে চাঁদা চাইবে বলে। কিন্তু দারোয়ান ঢুকতে দিচ্ছে না। সাহেবের বিশ্রামের ব্যাঘাত হবে বলে। ওরা তাই ক্ষুণ্ণমনে ফিরেই যাচ্ছে।

এমনি সময় দেখা হল জওহরের সাথে। হ্যাটকোট পরা সাহেব। চাঁদা চাওয়া ত কোন ছার, কোন কথাই ওরা বলতে পারে না ভয়ে।

খবরটা শুনে ভারী কষ্ট পেলেন জওহর। তাঁর মত তাঁরই দেশের ছেলেরা ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে। নিজের জন্য নয়। দেশের জন্য। দেশের দুঃস্থ মানুষদের জন্য। এই টাকা পেলে তবে তাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া সম্ভব হবে ওদের। এ টাকা না দিয়ে কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

ভাবীকালের প্রধানমন্ত্রী সাইকেল ছেড়ে নেমে পড়লেন। চেকবই বের করে লিখে দিলেন ওদের হাতে। টাকার অঙ্কও নেহাত কম নয়। বেশ মোটা অঙ্কের চেক।

চিরশিশু জওহরলাল ভালবাসতেন শিশুদের, তরুণদের।

ভালবাসতেন ফুলের মত মনের অধিকারী শিশু সমাজকে। গোলাপের আধফোটা কুঁড়ি সে ত তাদেরই প্রতীক।

পশু পাখীও তাঁর প্রিয় ছিল। তিনমূর্তি ভবনের সেই কুকুর দুটি আর ছোট্ট চিড়িয়াখানা ত সে কথাই বলে।

তিনি যেমন ভালবাসতেন অনেক কিছুই, তাঁকেও ভালবাসত বৈকি সবাই। ভারতের মানুষ তাঁকে আপন বলে জানত। বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে 'জওহর' মনে করত।

ভালবাসতেন বরণীয় নেতারাও। পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন তিনি গান্ধীজীর। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনেক আগেই মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, '......কয়েক বছর ধরেই আমি বলে আসছি এবং এখনও বলছি .....জওহরলাল হবে আমার উত্তরাধিকারী। ....আমি জানি, আমি যখন থাকব না, তখন জওহরলাল আমার ভাষাই বলবে।'

শুধু গান্ধীজী নন্, রবীন্দ্রনাথেরও যে তিনি বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন—এ পরিচয় বারবার মিলেছে। মিস্ এলিনোর র‍্যাথবোনের পত্রের যে ঐতিহাসিক জবাব রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন, সে পত্র তিনি লেখেন জওহরলালকে। জওহরলাল তখন কারাগারে। কবি লেখেন, 'তাঁর চিঠি প্রধানতঃ জওহরলালকে উদ্দেশ করেই লেখা। আর এ কথাও আমি নিশ্চিত জানি যে মিস র‍্যাথবোনের স্বদেশবাসীরা যদি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁর কণ্ঠরোধ না করে রাখতেন তবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহান্ নেতা তাঁর এই সম্পর্কিত উপদেশের সমুচিত নির্ভীক

প্রত্যুত্তর দিতেন। জোর করে তাঁকে মৌন করে রাখা হয়েছে, কাজেই রোগশয্যা থেকেও আমাকে এর প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।'

রবীন্দ্রনাথের এই কথা জওহরলালের পরে তাঁর অসাধারণ আস্থার পরিচয়ই দেয়। নিপীড়িত ভারতবর্ষের মূর্তপ্রতীক জওহরলালের সম্মান রাখতে অসুস্থ বিশ্বকবি সেদিন লেখনী ধরতে বাধ্য হলেন।

যেবার মজঃফরপুরে খুব ভূমিকম্প হয়, সেবার মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—অস্পৃশ্যতার জন্য এই বিপদ এসেছে। প্রতিবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

জওহরলাল স্বীকার করে গেছেন গান্ধীজীর কথা তাঁর মনোঃপূত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একমত। রবীন্দ্রনাথকে যে তিনি শ্রদ্ধা করতেন সে পরিচয় পাওয়া গেছে বারংবার।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগে গান্ধীজী এসেছিলেন একবার শান্তিনিকেতনে। সে সময় তিনি একটি চিঠি দেন গান্ধীজীর হাতে। তাতে লেখা ছিল রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মহাত্মা যেন শান্তিনিকেতনের ভার নেন। কথা রেখেছিলেন গান্ধীজী। জওহরলালের হাতে দিয়ে গেলেন বিশ্বভারতীর দায়িত্ব। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি জওহরলাল স্থাপন করে গেছেন।

বাংলা দেশের বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর পরম বরণীয়।

ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শুধু তাঁর বাবার বন্ধু নন্, জওহরলালের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর পিতৃতুল্য। সে কথা বাসন্তী দেবী আজও পরম স্নেহে বলে থাকেন।

আর, বাংলার হারিয়ে যাওয়া মাণিক সুভাষচন্দ্র তাঁর পরম সুহৃদ।

সব মিলিয়ে বাংলা দেশের সঙ্গে বাঙ্গালীর মনে তাঁর আসন পাতা। তিনি নিজে একাত্ম হয়ে যেতে চেয়েছিলেন বাংলা দেশের সঙ্গে। হৃদয়ের রাঙা রাখীর বিনিময়ে রক্তগোলাপের রাজা বাংলা দেশের প্রীতির সিংহাসনে বসেছেন।

ভারত ইতিহাসের গৌরময় যুগ যুদ্ধ বিগ্রহের যুগ নয়, সংস্কৃতির যুগ, শিল্পসৃষ্টির যুগ।

—জওহরলাল

জীবনের উল্লেখযোগ্য দিনগুলি

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর জন্ম।

১৯০৫ " ১৯শে অক্টোবর ইংলণ্ড যাত্রা। হ্যারো স্কুলে ভর্তি।

১৯০৭ " অক্টোবরে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যোগদান।

১৯১২ " ব্যারিষ্টারী পাশ। দেশে ফিরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগদান। প্রথম কংগ্রেসে যোগ।

১৯১৬ " শ্রীমতী কমলা কাউরের সঙ্গে বিবাহ। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্রথম দেখা।

১৯১৭ " ১৯শে নভেম্বর প্রথম সন্তান ইন্দিরার জন্ম।

১৯১৯ " দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

১৯২১ " কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেপ্তার শুরু। ৬ই ডিসেম্বর মতিলাল নেহরু ও জওহরলাল নেহরু গ্রেপ্তার।

১৯২২ " কারাগার থেকে বেরিয়ে সবরমতী জেলে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা। বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলন শুরু হয় ও পুনরায় গ্রেপ্তার।

১৯২৩ " কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্যের জন্য প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে থাকতে চাইলেন। এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী নির্বাচিত।

১৯২৬ „ পত্নী ও কন্যাসহ ইউরোপ গমন।

১৯২৭ „ ব্রুসেলস্‌এ নির্যাতিত জাতিসমূহের কংগ্রেসে যোগদান। বৃটেনকে তীব্র সমালোচনা। ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী ও রাশিয়া পরিদর্শন। নভেম্বর বিপ্লবের দশম স্মৃতি-বার্ষিকীতে যোগদান।

১৯২৮ „ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৯২৯ „ নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত।

১৯৩০ „ লবণ আইন ভঙ্গের জন্য গ্রেপ্তার ও কারাবরণ। এলাহাবাদে কৃষক আন্দোলনে যোগদান ও পুনরায় গ্রেপ্তার।

১৯৩১ „ কারামুক্তি। মতিলাল নেহরুর মৃত্যু। দু' বছরের জন্য আবার কারাগারে।

১৯৩৫ „ ১৫ই ফেব্রুয়ারী আলমোড়া ডিষ্ট্রিক্ট জেলে বসে 'আত্মজীবনী' রচনা সমাপ্ত। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচিত।

১৯৩৬ সুইজারল্যাণ্ডের লোজানে কমলা নেহরুর মৃত্যু।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ফৈজপুর অধিবেশনে সভাপতি।

১৯৩৮ ,, মা স্বরূপরাণীর মৃত্যু। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সভাপতিত্ব গ্রহণ। স্পেনে গমন।

১৯৩৯ ,, চীন পরিদর্শন।

১৯৪০ ,, চার বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড।

১৯৪১ ,, জেল থেকে মুক্তিলাভ।

১৯৪২ ,, চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে ভারতে আলোচনা। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্-এর সহিত ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনা। কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব উত্থাপন। পুনরায় গ্রেপ্তার।

১৯৪৪ ,, 'ডিস্কভারী অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ লেখা শুরু।

১৯৪৫ ,, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারকালে আইনজীবী হিসাবে সেনানীদের পক্ষাবলম্বন।

১৯৪৬ ,, অন্তবর্তীকালীন ভারত সরকারের মন্ত্রীসভার বহির্বিষয়ক সম্পর্কের দায়িত্ব লাভ। 'ডিস্কভারী অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ প্রকাশ। গণপরিষদে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা।

১৯৪৭ ,, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ১৫ই আগষ্ট বেতার ভাষণ।

১৯৪৮ ,, গণপরিষদে ভারতের নতুন গোষ্ঠীনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি বর্ণনা। ১২ই এপ্রিল হীরাকুঁদ বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ২০শে আগষ্ট

পারমাণবিক কমিশনের প্রথম বৈঠকে ভাষণ দান। ৬ই অক্টোবর গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীরূপে সম্মেলনে যোগদান। ৩রা নভেম্বর প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনের বিশেষ বৈঠকে ভাষণ দান! ২৩শে ডিসেম্বর ভারতীয় ঐতিহাসিক নজীর কমিশনের রজত জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ অত্যাচারের নিন্দা করার জন্য এশিয়ার ১৯টি জাতির এক সম্মেলনের উদ্বোধন। ২৪শে সেপ্টেম্বর পাকিস্থানকে ভারতের সহিত 'লড়াই নয়' ঘোষণায় যোগদানের আহ্বান। ১৯শে অক্টোবর মার্কিন কংগ্রেস ও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দান। ৬ই নভেম্বর নিগ্রোদের সেবার জন্য মার্কিন 'স্পিরগার্ন' পদক লাভ।

১৯৫০ „ ২৮শে জানুয়ারী ভারতের সুপ্রীম কোর্টের উদ্বোধন। সংখ্যালঘু সম্পর্কে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি সম্পাদন।

১৯৫১ „ কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচিত। হায়দ্রাবাদে সালার জং যাদুঘরের উদ্বোধন।

১৯৫২ „ সাঁচীতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগদান। ভারত-সিরিয়া চুক্তি সম্পাদন।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচিত। বিশ্ব-গান্ধী আলোচনাচক্রে যোগদান।

১৯৫৪ „ কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচিত। ২৯শে মার্চ ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের উদ্বোধন। ২৫শে জুন চীনা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাইকে অভ্যর্থনা এবং তাঁহার সহিত যুক্ত-ভাবে পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা।

১৯৫৫ „ বান্দুংএ অনুষ্ঠিত অ্যাফ্রো-এশীয় অধিবেশনে যোগদান। ১২ই মে দিল্লীতে জাতীয় যাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ১৫ই জুলাই 'ভারতরত্ন' সম্মান লাভ। ৬ই অক্টোবর বাঙ্গালোরে হিন্দু-স্থান মেশিন টুলস কারখানার উদ্বোধন। ১০ই ডিসেম্বর নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

১৯৫৬ „ বোম্বাইয়ে পারমাণবিক রিয়েক্টার স্থাপনের জন্য কানাডার সহিত চুক্তি সম্পাদন। ২৩শে জুলাই সুয়েজ খাল বিরোধের মীমাংসার জন্য শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ। ২৮শে নভেম্বর চীনা প্রধানমন্ত্রীর সহিত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে আলোচনা।

১৯৫৭ „ বুদ্ধদেবের ২৫০০তম মহানির্বাণ দিবসের অনু-ষ্ঠানাদির জন্য দালাই ও পাঞ্চেন লামার সহিত

নালন্দা গমন। ১৩ই জানুয়ারী হীরাকুঁদ পরিকল্পনার উদ্বোধন। ২৮শে জানুয়ারী ট্রম্বেতে এশিয়ার প্রথম রিয়েক্টারের উদ্বোধন।

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও আন্তর্জাতিক অর্থ করপোরেশনের এক যুক্ত বৈঠকের উদ্বোধন। ৮ই অক্টোবর ভারত ১৯৫৮ প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৯৫৯ " ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালোরের বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে ভাষণ দান। ২১শে জুলাই জব্বলপুরে ট্রাক নির্মাণ কারখানার উদ্বোধন।

১৯৬০ " ১৯শে সেপ্টেম্বর পাকিস্থানের সহিত সিন্ধুনদের জল বন্টন সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদন। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতারূপে রাষ্ট্রসংঘের শীর্ষ অধিবেশনে যোগদান ও বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দান।

১৯৬১ " ১৬ই জানুয়ারী বোম্বাইয়ে কানাডা-ভারত পারমাণবিক রিয়েক্টারের উদ্বোধন। ১৮ই জানুয়ারী চীন ভারতের উত্তর সীমান্তে অনুপ্রবেশের সংবাদ ঘোষণা।

১৯৬২ " ১লা জানুয়ারী আসামের নুনমাটি তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন। ২৪শে জানুয়ারী ভারতে তৈয়ারী নিশান গাড়ীর উদ্বোধন। প্যারিসে

রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার বৈঠকে ভাষণ দান। ২২শে অক্টোবর চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জনে নির্মিত প্রথম বিদ্যুৎচালিত রেল ইঞ্জিন 'লোকমান্যের' উদ্বোধন। ভাক্রা বাঁধের উদ্বোধন।

১৯৬৪ " জানুয়ারী মাসে উড়িষ্যার টিকরেপাড়া বাঁধের উদ্বোধন, ঐ মাসে ভুবনেশ্বর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় অসুস্থতাবোধ। মে মাসে কোশী ও গণ্ডক পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন। ২৭শে মে বেলা দুটোর সময় দিল্লীতে মহাপ্রয়াণ। শেষ লেখা তাঁর সরকারী নথিপত্রে—'যা কিছু কাগজ-পত্র ছিল, ফাইলের যা কাজ ছিল—সব শেষ করে দিয়েছি।'

জওহরলাল
বিশ্বজনের মনে

দেশে—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে বলতেন 'ঋতুরাজ'। তিনি বলেছেন—জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে অধিষ্ঠিত হবার অধিকারী। অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট—কিন্তু সকলের চেয়ে বড় তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা।

পলিটিক্সের সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পর-প্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলেন নি। সত্য যেখানে বিপজ্জনক, সেখানে সত্যকে তিনি ভয় করেন নি, মিথ্যা সেখানে সুবিধা-জনক, সেখানে তিনি সহায় করেন নি মিথ্যাকে।

মহাত্মা গান্ধী বলতেন—এক গুরুদায়িত্ব তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। এ দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত করা হল, কারণ একে বহন করবার মত সামর্থ তোমার আছে।

তিনি বলেছিলেন আরও—আমি চাই, তুমি এগিয়ে এস, ভার নাও, গ্রহণ কর নেতৃত্ব, দেশকে তোমার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—বর্তমানে যাঁরা অগ্রগণ্য নেতা তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার কাছেই আমরা এই আশা করতে পারি যে কংগ্রেসকে প্রগতির পথে পরিচালনা করা হবে।

সরোজিনী নাইডু—

আমার স্নেহের জওহর—

ইতিহাস হয়ে গেল তোমার জীবনের প্রথম অর্ধ শতাব্দী। আজ তা স্বমহিমায় প্রকাশ পাচ্ছে নিটোল একটি কাহিনীর গানের মতো। আগামী অর্ধশতাব্দী রূপায়িত করুক তোমার ধ্যান, বাস্তব করে তুলুক তোমার স্বপ্নকে। বহন করে আনুক তোমার সাধনার সিদ্ধি। মানুষের ইতিহাসে অমরতা দিক তোমার নামকে মানব মুক্তির একজন প্রধান সেনাপতি হিসাবে।.........

তোমার জন্য তোমার কবি-ভগ্নীর, তোমার সহ-সাধিকার এই প্রার্থনা!

দেশবন্ধু-পত্নী বাসন্তী দেবী—

জওহর আমার কি ছিল বলতে পারিনা। সে আমার ছেলের মত।

বিদেশে—

গান্ধীর উত্তরাধিকারী এবং ভারতের জননায়ক হিসাবে আমরা, বিজ্ঞানপূজারী মানুষেরা, আজ পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য জওহরলাল নেহরুর দিকে তাকিয়ে আছি। ভারতকে পরিচালিত করে তিনি এই দায়িত্ব অর্জন করেছেন।

—আলবার্ট আইনস্টাইন

১৪ বৎসর কারাবাসের পরেও তিনি দণ্ডদাতাদের প্রতি কোনরকম তিক্ততা দেখান নাই। নেহরু ছিলেন এমনই মানুষ। তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করলে মানব সমাজের প্রতি তাঁর অবদানের ব্যাপ্তি আমরা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারি।

— বার্ট্রাণ্ড রাসেল

এশিয়ার লেনিনের সমতুল্য একমাত্র আপনি।

—বার্নার্ড শ

প্রিয় বন্ধু, আপনার স্বাস্থ্য অটুট থাকুক, আপনি সুখী হন, এবং ভারতবর্ষের যে আদর্শ নিয়ে আপনি সংগ্রাম করছেন, তা জয়যুক্ত হোক।

—রোমা রোলাঁ্যা

এই বিশ্বে মানবজীবনের প্রত্যেক শতাব্দীতে খুব কম লোকই থাকেন যাঁহারা আমাদের সকলের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। এই রকম একজন লোক ছিলেন জওহরলাল নেহরু। কয়েক দশক যাবৎ তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আমাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন এবং তাহাও সকল সময় আমাদের কল্যাণের জন্য।

পার্ল· এস· বাক

যে সব পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে—

"আত্মজীবনী"—জওহরলালকৃত

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অনূদিত

"বিশ্বভারতী" পত্রিকা

(২১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

এবং

জওহরলালের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সংবাদ পত্র-পত্রিকাগুলি।